নবীন বিজ্ঞানী

প্রকাশকাল: জুন, ২০২৬খ্রিঃ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি

সুকল্যান বাছাড়
সিনিয়র কিউরেটর

সম্পাদকমন্ডলী

মোঃ হাদিসুর রহমান
লাইব্রেরিয়ান কাম ডকুমেন্টেশন অফিসার

এম.এম. রুবায়েত হোসেন
সহকারী কিউরেটর

শাফিয়া তাসনীম দ্রাঘীমা
সহকারী কিউরেটর

ফরহাদ শেখ
সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার

প্রচ্ছদ
রবিন বসাক
সহকারী কিউরেটর (চলতি দায়িত্ব)

প্রকাশনায়
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

যোগাযোগ-
ফোন: ০২-৫৮১৬০৬০২
ই-মেইল: infonmst@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.nmst.gov.bd

মূল্য: ১০০ টাকা।



বাণী

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই যুগে প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ আমাদের চিন্তার জগৎকে এক অভূতপূর্ব পুনর্গঠনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এই বিশ্বজনীন চ্যালেঞ্জকে নতুন সম্ভাবনায় রূপ দিয়ে নিজেদের দক্ষ ও টেকসই হিসেবে টিকিয়ে রাখাই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই মহৎ লক্ষ্য অর্জনে একটি বিজ্ঞানমনস্ক, উদ্ভাবনী ও দূরদর্শী তরুণ সমাজ বিনির্মাণের কোনো বিকল্প নেই।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর তরুণ সমাজকে বিজ্ঞানের আধুনিক ধারার সাথে সম্পৃক্ত করতে এবং তাদের মাঝে অনুপ্রেরণা ছড়িয়ে দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলোকে সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তিকে শাণিত করাই আমাদের মূল অভিপ্রায়। এই জ্ঞানভিত্তিক যাত্রায় 'নবীন বিজ্ঞানী' ম্যাগাজিনটি ইতোমধ্যে একটি সমাদৃত মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, 'জুন ২০২৬'-এর এই নতুন সংখ্যাটিতে সমসাময়িক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই প্রকাশনাটি তরুণ পাঠকদের অনুসন্ধিৎসু মনকে আরও সমৃদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবে। যেসব গুণী লেখক তাঁদের মূল্যবান লেখনীর মাধ্যমে এই সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি, জাদুঘরের যেসকল সহকর্মী তাঁদের মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে এই প্রকাশনাটি সফলভাবে সুধী পাঠকের হাতে পৌঁছে দেয়ার কাজে ব্রত রয়েছেন, তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি 'নবীন বিজ্ঞানী'-এর এই নতুন সংখ্যার বহুল প্রচার ও সাফল্য কামনা করি।

ড. মো. মনিরুজ্জামান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

সূচিপত্র

১। **স্বাস্থ্যবিধি**
সুকল্যাণ বাছাড় ০৫

২। **উদ্ভিদের ভেষজ গুণে রোগ নিরাময়**
হোসনে আরা পারভিন ১৭

৩। **মানুষের মহাজাগতিক ঠিকানা**
মোঃ হাদিসুর রহমান ৩০

৪। **জলবিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস**
এম.এম রুবায়েত হোসেন ৪০

৫। **পুস্তক পর্যালোচনা: দ্য থিওরি অব এভরিথিং**
মোঃ খাইরুল ইসলাম ৫১

৬। **রহস্যের নাম ডার্ক এনার্জি**
আবুল বাসার ৫৪

৭। **আলো এক অদৃশ্য জাদুকর**
মাঃ ইসমাইল হোসেন আশিক ৬১

8. **Moonbow: The Symphony in White**
Salahuddin Mokbul Galib ৬৩

স্বাস্থ্যবিধি

সুকল্যাণ বাছাড়

১. স্বাস্থ্যবিধির সংজ্ঞা ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা (Definition and Scientific Analysis)

স্বাস্থ্যবিধি বা 'Hygiene' কেবল বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার একটি সমষ্টি নয় বরং এটি একটি সুসংহত জীবনদর্শন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মপদ্ধতি। আধুনিক জনস্বাস্থ্যের (Public Health) ভাষায়, স্বাস্থ্যবিধি হলো সেই সমস্ত অভ্যাস ও জৈবিক নীতিমালার প্রয়োগ, যা একজন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক সুস্থতাকে দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা প্রদান করে। এটি রোগের অনুপস্থিতিকে বোঝায় না বরং কোষীয় স্তর থেকে সামাজিক স্তর পর্যন্ত প্রতিটি কার্যের অনুকূল অবস্থাকে নির্দেশ করে। স্বাস্থ্যবিধির মূল লক্ষ্য হলো শরীরের 'Homeostasis' বা অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বজায় রাখা। যখন আমরা নিয়মিত সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখি, তখন শরীরের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা একটি সুরক্ষিত প্রাচীর তৈরি করে, যা বাইরের প্যাথোজেন বা জীবাণুর আক্রমণকে নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হয়।

১.১ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সংজ্ঞা ও গাণিতিক বিশ্লেষণ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) স্বাস্থ্যকে একটি স্থিতিশীল অবস্থা হিসেবে নয় বরং একটি গতিশীল সমীকরণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে, স্বাস্থ্য কোনো একক বিষয় নয় বরং চারটি প্রধান স্তম্ভের সমষ্টি:

Health = Physical Well-Being+Mental Well-being

+Environmental Well-being+Social Well-being

নিচে এই সমীকরণের প্রতিটি উপাদানের বিস্তারিত এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো:

ক) শারীরিক সুস্থতা (Physical Well-being):

শারীরিক সুস্থতা হলো দেহের জৈবিক যন্ত্রপাতির সঠিক কার্যকারিতা। এটি প্রধানত চারটি উপ-উপাদানের ওপর নির্ভরশীল:

- **পুষ্টি (Nutrition):** এটি কোষের শক্তি উৎপাদন বা ATP তৈরির জ্বালানি। সুষম খাদ্য ব্যতীত শরীরের মেটাবলিজম বা বিপাকক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

- **ব্যায়াম (Exercise):** নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম হৃদপিণ্ডের কার্যক্ষমতা বাড়ায় এবং পেশির এনজাইমগুলোকে সক্রিয় রাখে।

- **বিশ্রাম (Rest):** ঘুমের সময় শরীরের টিস্যু পুনর্গঠিত হয় এবং মেমোরি কনসোলিডেশন ঘটে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম ব্যতিরেকে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

🗗 **রোগ প্রতিরোধ (Disease Prevention):** ইমিউনোগ্লোবিউলিন এবং শ্বেত রক্তকণিকার মাধ্যমে জীবাণুর বিরুদ্ধে শরীরের সক্রিয় প্রতিরোধ।

খ) মানসিক সুস্থতা (Mental Well-being):

মানসিক সুস্থতা মূলত মস্তিষ্কের রাসায়নিক সংকেত এবং মনস্তাত্ত্বিক স্থিতিশীলতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

🗗 **নিউরোট্রান্সমিটার (Neurotransmitters):** মস্তিষ্কের রাসায়নিক দূত যেমন সেরোটোনিন (Serotonin) যা আমাদের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ডোপামিন (Dopamine) যা আনন্দ ও পুরস্কারের অনুভূতি দেয়। এদের ভারসাম্যহীনতা মানসিক অবসাদ তৈরি করে।

🗗 **স্ট্রেস হরমোন (Stress Hormones):** যখন আমরা মানসিক চাপে থাকি, তখন অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে কর্টিসল (Cortisol) নিঃসৃত হয়। দীর্ঘমেয়াদী উচ্চ কর্টিসল লেভেল শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

🗗 **মানসিক স্থিতিশীলতা:** জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার ক্ষমতা এবং আবেগীয় বুদ্ধি (Emotional Intelligence) ।

গ) পরিবেশগত সুস্থতা (Environmental Well-being):

মানুষ ও তার চারপাশের পরিবেশের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়াই হলো পরিবেশগত সুস্থতা। এটি নির্ধারিত হয়:

🗗 **বায়ু ও পানি:** বিশুদ্ধ অক্সিজেন এবং খনিজ সমৃদ্ধ নিরাপদ পানি কোষের বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে।

🗗 **স্যানিটেশন:** বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঠিক পদ্ধতি প্যাথোজেনিক বিস্তার রোধ করে।

🗗 **বাস্তুসংস্থান:** প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য সরাসরি মানুষের শ্বাসতন্ত্র ও অ্যালার্জিজনিত সমস্যার সাথে সম্পর্কিত।

ঘ) সামাজিক সুস্থতা (Social Well-being):

মানুষ সামাজিক জীব, তাই তার সুস্থতা সমাজের সাথে তার সংযোগের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল:

🗗 **পারস্পরিক সম্পর্ক:** পরিবার ও বন্ধুদের সাথে সুস্থ সম্পর্ক মস্তিষ্কে অক্সিটোসিন (Oxytocin) নিঃসরণ করে, যা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

🗗 **সামাজিক সংযোগ:** একাকীত্ব বর্জন এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ মানসিক সুস্থতার পাশাপাশি দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করে।

🗗 **কর্মক্ষেত্রের ভারসাম্য:** কাজের পরিবেশ এবং সামাজিক নিরাপত্তা একজন ব্যক্তির সামগ্রিক মানসিক প্রশান্তির অন্যতম নিয়ন্ত্রক।

২. শারীরিক স্বাস্থ্যবিধি ও গাণিতিক পরিমাপ (Physical Hygiene and Mathematical Metrics)

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধি কেবল একটি অভ্যাস নয়, এটি মূলত মানবদেহের জৈব-রাসায়নিক এবং কাঠামোগত স্থিতিশীলতা রক্ষার একটি গাণিতিক বিজ্ঞান। শরীরের ওজন, উচ্চতা এবং বিপাকীয় হারের মধ্যকার ভারসাম্য নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন গাণিতিক মডেল ব্যবহৃত হয়, যা একজন ব্যক্তির শারীরিক ঝুঁকির পূর্বাভাস দিতে সক্ষম।

২.১ বডি মাস ইনডেক্স (BMI): কাঠামোগত বিশ্লেষণ ও ক্লিনিক্যাল গুরুত্ব

বডি মাস ইনডেক্স বা BMI হলো মানবদেহের টিস্যু ভরের (পেশি, চর্বি ও হাড়) একটি সাধারণ সূচক। এটি মূলত একজন ব্যক্তির মোট ওজন এবং তার উচ্চতার বর্গের মধ্যকার অনুপাতকে নির্দেশ করে। এটি চিকিৎসাবিজ্ঞানে একজন ব্যক্তির শরীরের চর্বির আধিক্য বা ঘাটতি নির্ণয়ের প্রাথমিক ও কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত।



BMI-এর গাণিতিক সূত্রঃ $$\text{BMI} = \frac{\text{ওজন (kg)}}{\text{উচ্চতা (m)}^2}$$

বিস্তারিত ক্যাটাগরি বিশ্লেষণ (WHO মানদণ্ড অনুযায়ী):

১. কম ওজন (Underweight - BMI < ১৮.৫): এটি নির্দেশ করে যে শরীরের প্রয়োজনীয় চর্বি এবং পেশি ভরের ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, অ্যানিমিয়া এবং অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

২. স্বাভাবিক ওজন (Normal Weight - ১৮.৫ – ২৪.৯): এটি সুস্থ শরীরের আদর্শ মান। এই সীমায় থাকলে মেটাবলিক রোগ যেমন–টাইপ ২ ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের ঝুঁকি সর্বনিম্ন থাকে।

৩. অতিরিক্ত ওজন (Overweight - ২৫.০ – ২৯.৯): এটি স্থূলতার পূর্ববর্তী অবস্থা। এই স্তরে শরীরের লিপিড প্রোফাইল অস্বাভাবিক হতে শুরু করে এবং উচ্চ রক্তচাপের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

৪. স্থূলতা শ্রেণি ১ (Obesity Class ১ - ৩০.০ – ৩৪.৯): এটি একটি ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন। এই পর্যায়ে শরীরে ভিসারাল ফ্যাট (অভ্যন্তরীণ চর্বি) বৃদ্ধি পায়, যা ধমনীতে রক্ত সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহ (Chronic Inflammation) তৈরি করে।

২.২ স্বাস্থ্যবিধি সূচক (Health Hygiene Index - HI): একটি সমন্বিত মডেল ব্যক্তির সামগ্রিক সুস্থতা পরিমাপের জন্য কেবল ওজন বা উচ্চতা যথেষ্ট নয়। এজন্য একটি উন্নত গাণিতিক মডেল ব্যবহার করা হয় যা 'Health Hygiene Index' বা HI নামে পরিচিত। এই সূচকটি পুষ্টি, ব্যায়াম এবং মানসিক অবস্থার একটি তুলনামূলক অনুপাত।

HI-এর সমীকরণ:

$$HI = \frac{NV}{DR} + \frac{EE}{RP} + \frac{MS}{SL}$$

সমীকরণের চলকসমূহের গভীর বিশ্লেষণ:

- $\frac{NV}{DR}$ **(পুষ্টির অনুপাত):** এখানে (Nutritional Value) হলো গৃহীত খাদ্যের গুণমান এবং (Daily Requirement) হলো শরীরের দৈনিক চাহিদা। যদি এই অনুপাত ১-এর কম হয়, তবে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি দেখা দেয়।

- $\frac{EE}{RP}$ **(শারীরিক সক্রিয়তা ও পুনরুদ্ধারের অনুপাত):** (Exercise Efficiency) বা ব্যায়ামের কার্যকারিতা এবং (Rest Period) বা বিশ্রামের সময়ের অনুপাত। অতিরিক্ত ব্যায়াম এবং অপর্যাপ্ত বিশ্রাম শরীরের টিস্যু ক্ষয় (Overtraining syndrome) ঘটায়। তাই এই দুটির মধ্যে ভারসাম্য থাকা অপরিহার্য।

- $\frac{MS}{SL}$ **(মনস্তাত্ত্বিক স্থিতিশীলতা সূচক):** (Mental Stability) বা মানসিক স্থিতিশীলতা এবং (Stress Level) বা মানসিক চাপের স্তরের অনুপাত। উচ্চ মাত্রার মানসিক চাপ (SL) আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেমকে সংকুচিত করে ফেলে, যা সামগ্রিক মানকে কমিয়ে দেয়।

এই গাণিতিক মডেলটি একজন ব্যক্তির জীবনযাত্রার মানকে সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে, যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে কোনো বড় ধরণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়।

৩. বিপাকক্রিয়া ও ক্যালোরি বিশ্লেষণ (Metabolism and Calorimetric Analysis)

মানুষের শরীর একটি জটিল জৈব-রাসায়নিক কারখানার মতো কাজ করে। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তা কোষীয় স্তরে শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া এবং সেই শক্তি দিয়ে শরীরের পুনর্গঠন হওয়ার সামগ্রিক প্রক্রিয়াই হলো বিপাকক্রিয়া বা মেটাবলিজম। এটি জীবনের চালিকাশক্তি যা প্রতিটি সেকেন্ডে শরীরে ঘটে চলা হাজার হাজার রাসায়নিক বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩.১ মেটাবলিজম (Metabolism): শক্তি রূপান্তরের জৈব-রসায়ন

বিপাকক্রিয়া মূলত দুটি পরস্পরবিরোধী অথচ পরিপূরক প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত। এই দুটি প্রক্রিয়ার ভারসাম্যই নির্ধারণ করে একজন ব্যক্তির ওজন বাড়বে, কমবে নাকি স্থিতিশীল থাকবে।

১. ক্যাটাবলিজম (Catabolism) - শক্তিমুক্তি প্রক্রিয়া:

ক্যাটাবলিজম হলো একটি ভাঙনমূলক প্রক্রিয়া যেখানে শরীরের জটিল জৈব অণুগুলো ভেঙে সরল অণুতে পরিণত হয় এবং শক্তি নির্গত করে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির প্রধান উৎস হলো গ্লুকোজের জারণ।

রাসায়নিক সমীকরণ:

$$C_6H_{12}O_6 \text{ (গ্লুকোজ)} + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 38ATP$$

বিশ্লেষণ: এই বিক্রিয়ায় গ্লুকোজ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ভেঙে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং পানি তৈরি করে। এর ফলে উৎপন্ন হয় 38 ATP (Adenosine Triphosphate), যা কোষের 'শক্তির মুদ্রা' (Energy Currency) হিসেবে পরিচিত। এই শক্তিই আমাদের হৃদপিণ্ড সচল রাখা থেকে শুরু করে চিন্তাভাবনা পর্যন্ত সকল কাজে ব্যবহৃত হয়।

২. অ্যানাবলিজম (Anabolism) - গঠনমূলক প্রক্রিয়া:

অ্যানাবলিজম হলো একটি সংশ্লেষণমূলক প্রক্রিয়া যেখানে ক্যাটাবলিজম থেকে প্রাপ্ত শক্তি ব্যবহার করে শরীর নতুন কোষ, পেশি তন্তু এবং এনজাইম তৈরি করে।

উদাহরণ: অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণ। যখন আমরা ব্যায়াম করি, তখন এই অ্যানাবলিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত পেশি পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী হয়।

৩.২ দৈনিক ক্যালোরি চাহিদা (Total Daily Energy Expenditure - TDEE)

একজন ব্যক্তির স্বাস্থ্যবিধি ঠিক রাখার জন্য তার শরীরের শক্তির আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা অপরিহার্য। TDEE হলো একজন ব্যক্তি প্রতিদিন মোট কতটুকু ক্যালরি খরচ করেন তার নিখুঁত পরিমাপ।

TDEE নির্ণয়ের গাণিতিক মডেল:

১. বেসাল মেটাবলিক রেট (BMR):

BMR হলো সেই পরিমাণ শক্তি যা শরীর সম্পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় (যেমন ঘুমের সময়) কেবল বেঁচে থাকার প্রাথমিক কাজগুলো (শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন, কোষ উৎপাদন) সম্পাদন করতে খরচ করে।

Mifflin-St Jeor সমীকরণ (পুরুষদের জন্য):

$$\text{BMR} = 10 \times \text{ওজন(kg)} + 6.25 \times \text{উচ্চতা(cm)} - 5 \times \text{বয়স(বছর)} + 5$$

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: এই সূত্রে ওজন এবং উচ্চতা বাড়লে BMR বাড়ে, কারণ বড় শরীরের রক্ষণাবেক্ষণে বেশি শক্তি লাগে। আবার বয়স বাড়লে BMR কমে যায়, কারণ বয়সের সাথে সাথে শরীরের পেশি ভর (Muscle Mass) কমতে থাকে এবং বিপাকীয় গতি ধীর হয়ে যায়।

২. অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর (Activity Factor):

একই BMR সম্পন্ন দুজন ব্যক্তির ক্যালরি চাহিদা ভিন্ন হতে পারে তাদের পরিশ্রমের মাত্রার কারণে।

- **Sedentary (অলস জীবনযাপন):** BMR X1.2
- **Moderately Active (মাঝারি পরিশ্রম):** BMR X1.55
- **Extra Active (অত্যধিক পরিশ্রম):** BMR X1.9

যদি আপনার গৃহীত ক্যালরি TDEE-এর সমান হয়, তবে আপনার ওজন স্থিতিশীল থাকবে। যদি ক্যালরি গ্রহণ TDEE-এর চেয়ে বেশি হয় তবে তা চর্বি হিসেবে জমা হবে (Positive Energy Balance), আর কম হলে ওজন কমবে (Negative Energy Balance)।

৪. রোগ প্রতিরোধ ও ইমিউনোলজি (Immunology and Mathematical Epidemiology)

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ইমিউনোলজি হলো শরীরের একটি জটিল প্রতিরক্ষা প্রকৌশল। এটি কেবল জীবাণু ধ্বংস করে না বরং গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে জনসমষ্টিতে রোগের বিস্তারের পূর্বাভাস প্রদান এবং কোষীয় স্তরে ভবিষ্যতের জন্য স্মৃতি (Memory) সংরক্ষণ করে।

৪.১ SIR মডেল: মহামারী বিজ্ঞানের গাণিতিক কাঠামো (Mathematical Modeling of Epidemics)

মহামারী বিজ্ঞানে (Epidemiology) একটি সংক্রামক রোগ কীভাবে একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তা বোঝার জন্য SIR মডেল সবচেয়ে শক্তিশালী গাণিতিক হাতিয়ার। এই মডেলটি পুরো জনসংখ্যাকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করে:

- **S (Susceptible):** যারা সুস্থ কিন্তু সংক্রমিত হতে পারে।
- **I (Infectious):** যারা সংক্রমিত এবং রোগ ছড়াতে সক্ষম।
- **R (Recovered/Removed):** যারা সুস্থ হয়ে গেছে এবং যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়েছে।

মডেলের ডিফারেনশিয়াল সমীকরণসমূহের গভীর বিশ্লেষণ:

১. সংবেদনশীল জনগোষ্ঠী হ্রাসের হার: $\frac{dS}{dt} = -\beta SI$

ব্যাখ্যা: এখানে β হলো সংক্রমণের হার (Infection Rate) । এই সমীকরণটি দেখায় যে, সুস্থ মানুষ (S) এবং আক্রান্ত মানুষের (I) পারস্পরিক সংস্পর্শ যত বাড়বে, সুস্থ মানুষের সংখ্যা তত দ্রুত হ্রাস পাবে (ঋণাত্মক চিহ্ন এটিই নির্দেশ করে) ।

২. সংক্রামিত জনগোষ্ঠীর পরিবর্তনের হার: $\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I$

ব্যাখ্যা: এটি মডেলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে Y হলো সুস্থ হওয়ার হার (Recovery Rate) । যদি $\beta SI > \gamma I$ হয়, তবে মহামারীর বিস্তার ঘটবে। এখান থেকেই Basic Reproduction Number (R_0) বের করা হয়।

৩. সুস্থ জনগোষ্ঠী বৃদ্ধির হার: $\frac{dR}{dt} = \gamma I$

ব্যাখ্যা: এটি নির্দেশ করে যে, সময়ের সাথে সাথে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট হারে সুস্থ হয়ে সুস্থ জনগোষ্ঠীর (R) অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। একবার R শ্রেণিতে চলে গেলে তারা সাধারণত পুনরায় আক্রান্ত হয় না (প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনের কারণে) ।

৪.২ অ্যান্টিবডি তৈরির প্রক্রিয়া ও কোষীয় প্রতিরক্ষা (Cellular Defense Mechanism)

যখন কোনো প্যাথোজেন (ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া) শরীরে প্রবেশ করে বা টিকার মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে জীবাণুর অংশ প্রবেশ করানো হয়, তখন শরীরের ইমিউন সিস্টেম একটি বহুধাপ বিশিষ্ট প্রতিরক্ষা প্রক্রিয়া শুরু করে।

১. B-Cell এবং হিউমোরাল ইমিউনিটি:

শনাক্তকরণ: B-Cell-এর গায়ে থাকা রিসেপ্টর সরাসরি জীবাণুর অ্যান্টিজেন শনাক্ত করে।

অ্যান্টিবডি উৎপাদন: সক্রিয় হওয়ার পর B-Cell বিভাজিত হয়ে 'প্লাজমা কোষ' তৈরি করে, যা প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার অ্যান্টিবডি (Immunoglobulins) নিঃসরণ করে। এই অ্যান্টিবডিগুলো জীবাণুকে আঠার মতো আটকে দেয় এবং নিষ্ক্রিয় করে ফেলে।

২. T-Cell এবং কোষ-নির্ভর প্রতিরক্ষা:

- Cytotoxic T-Cells: এরা সরাসরি ভাইরাস আক্রান্ত কোষগুলোকে শনাক্ত করে এবং সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয় যাতে ভাইরাস আর ছড়াতে না পারে।
- Helper T-Cells: এরা ইমিউন সিস্টেমের 'কমান্ডার' হিসেবে কাজ করে এবং অন্যান্য কোষকে সঙ্কেত পাঠায়।

৩. ইমিউনোলজিক্যাল মেমোরি (Immunological Memory):

সংক্রমণ বা টিকাদানের পর শরীরে কিছু বিশেষ মেমোরি সেল (Memory B and T Cells) স্থায়ীভাবে থেকে যায়।

- **দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা:** এই কোষগুলো কয়েক বছর বা সারাজীবন ওই নির্দিষ্ট জীবাণুর 'blueprint' মনে রাখে।
- **দ্রুত প্রতিক্রিয়া:** ভবিষ্যতে একই জীবাণু পুনরায় শরীরে প্রবেশ করলে ইমিউন সিস্টেম কোনো প্রাথমিক লক্ষণ ছাড়াই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিশাল সংখ্যক অ্যান্টিবডি তৈরি করে আক্রমণ নস্যাৎ করে দেয়। এটিই স্বাস্থ্যবিধির মূল লক্ষ্য—শরীরের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত রাখা।

৫. মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি (Mental and Social Hygiene: A Bio-Social Approach)

স্বাস্থ্যবিধির এই অংশটি মূলত মানুষের মনস্তাত্ত্বিক স্থিতিশীলতা এবং তার সামাজিক অস্তিত্বের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে মানসিক স্বাস্থ্যবিধিকে নিউরোকেমিক্যাল ভারসাম্যের একটি ফল হিসেবে দেখা হয়, যেখানে সামাজিক পরিবেশ অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

৫.১ নিউরোট্রান্সমিটার, হরমোন এবং মুড রেগুলেশন

আমাদের প্রতিটি আবেগ, চিন্তা এবং আচরণ মূলত মস্তিষ্কের রাসায়নিক পদার্থের সূক্ষ্ম ভারসাম্যের ফসল। এই রাসায়নিক দূতগুলোকে বলা হয় নিউরোট্রান্সমিটার।

১. সেরোটোনিন (Serotonin): স্থিতিশীলতার নিয়ন্ত্রক

- **ভূমিকা:** সেরোটোনিনকে বলা হয় 'Feel Good' হরমোন। এটি মূলত অন্ত্র এবং মস্তিষ্কে তৈরি হয়। এটি আমাদের মেজাজ (Mood), ক্ষুধা এবং ঘুমের চক্র (Circadian Rhythm) নিয়ন্ত্রণ করে।
- **বৈজ্ঞানিক প্রভাব:** শরীরে সেরোটোনিনের সঠিক মাত্রা মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। এর অভাব ঘটলে বিষণ্নতা (Depression), অনিদ্রা এবং উদ্বেগজনিত ব্যাধি তৈরি হতে পারে। পর্যাপ্ত সূর্যালোক এবং ট্রিপটোফ্যান সমৃদ্ধ খাবার সেরোটোনিন উৎপাদনে সহায়তা করে।

২. ডোপামিন (Dopamine): অনুপ্রেরণা ও পুরস্কারের উৎস

🗗 **ভূমিকা:** ডোপামিন হলো মস্তিষ্কের 'Reward System'-এর প্রধান চালিকাশক্তি। কোনো কাজ শেষ করার পর যে তৃপ্তি বা আনন্দের অনুভূতি হয়, তা মূলত ডোপামিনের কারণে ঘটে।

🗗 **বৈজ্ঞানিক প্রভাব:** এটি আমাদের মনোযোগ, শেখার ক্ষমতা এবং সৃজনশীলতার সাথে সরাসরি যুক্ত। ডোপামিনের মাত্রা কমে গেলে কাজে অনীহা এবং লক্ষ্যহীনতা তৈরি হয়। তবে অতিরিক্ত ডোপামিন আসক্তি (Addiction) সৃষ্টির জন্য দায়ী হতে পারে।

৩. কর্টিসল (Cortisol): স্ট্রেস বা চাপের প্রভাবক

🗗 **ভূমিকা:** এটি একটি স্টেরয়েড হরমোন যা বিপদের সময় বা মানসিক চাপের মুখে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে নির্গত হয়। একে 'Fight or Flight' হরমোনও বলা হয়।

🗗 **নেতিবাচক প্রভাব:** আধুনিক জীবনযাত্রায় দীর্ঘমেয়াদী মানসিক চাপ (**Chronic Stress**) রক্তে কর্টিসলের মাত্রা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, ঘুম ব্যাহত হয় এবং সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো–এটি শরীরের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়, ফলে শরীর সহজেই রোগে আক্রান্ত হয়।

৫.২ সামাজিক সুস্থতা সূচক (Social Well-being Index - SWB): গাণিতিক বিশ্লেষণ

মানুষ কেবল জৈবিক সত্তা নয় বরং একটি সামাজিক একক। একজন ব্যক্তির সামগ্রিক সুস্থতা পরিমাপের জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা SWB Index নামক একটি ওয়ান-লেভেল গাণিতিক মডেল ব্যবহার করেন। এটি নির্দেশ করে যে একটি উন্নত সামাজিক কাঠামো কীভাবে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়।

গাণিতিক সমীকরণ:

$$\mathrm{SWB} = w_1 \cdot H + w_2 \cdot E + w_3 \cdot S + w_4 \cdot P + w_5 \cdot I$$

উপাদানসমূহের বিস্তারিত বিশ্লেষণ:

🗗 H (Health - স্বাস্থ্য): শারীরিক সক্ষমতা এবং চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তির সুযোগ। এটি সামাজিক সুস্থতার প্রাথমিক ভিত্তি।

🗗 E (Education - শিক্ষা): জ্ঞানতাত্ত্বিক বিকাশ এবং সচেতনতা। শিক্ষা স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে সংক্রমণের হার কমায়।

🗗 **S (Security - নিরাপত্তা):** ব্যক্তিগত ও আর্থিক নিরাপত্তা। নিরাপত্তাহীনতা সরাসরি কর্টিসল লেভেল বাড়িয়ে মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়।

🗗 **P (Participation - অংশগ্রহণ):** সামাজিক কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ। এটি একাকীত্ব দূর করে এবং ডোপামিন ও অক্সিটোসিন লেভেল বাড়ায়।

🗗 **I (Social Justice - সামাজিক ন্যায়বিচার):** সম্পদে সমান অধিকার এবং বৈষম্যহীন সমাজ। সামাজিক অবিচার দীর্ঘমেয়াদী মানসিক চাপের (Social Stress) অন্যতম প্রধান কারণ।

🗗 **W_1 থেকে W_5(Weights):** এগুলো হলো প্রতিটি উপাদানের গুরুত্বের ভার বা Weightage, যা সমাজ বা পরিবেশভেদে পরিবর্তিত হতে পারে।

সারসংক্ষেপ: এই সমীকরণটি প্রমাণ করে যে, স্বাস্থ্যবিধি কেবল সাবান দিয়ে হাত ধোয়া নয়; বরং এটি একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ ব্যবস্থা এবং মস্তিষ্কের রাসায়নিক ভারসাম্যের এক অনন্য সমন্বয়।

৬. মানব উন্নয়ন সূচক ও স্বাস্থ্যবিধির চূড়ান্ত বিশ্লেষণ (Human Development Index - HDI)

স্বাস্থ্যবিধি এবং জনস্বাস্থ্যের সফলতার চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে একটি দেশের মানব উন্নয়ন সূচক বা HDI-এর মাধ্যমে। এটি কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয় বরং মানুষের আয়ু এবং জ্ঞানের স্তরের একটি সমন্বিত গাণিতিক রূপ। নথির এই অংশে একটি বিশেষ গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধির প্রভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৬.১ HDI-এর গাণিতিক কাঠামো (Mathematical Framework of HDI)

HDI হলো তিনটি প্রধান সূচকের জ্যামিতিক গড় (Geometric Mean)। এর গাণিতিক রূপটি নিম্নরূপ:

HDI = (Life Expectancy Index x Education Index x Income Index)$^{1/3}$

বা আরও বিস্তারিতভাবে:

$$HDI = \left[\frac{LE-min}{max-min} \times \frac{MYS-min}{max-min} \times \frac{\ln(GNIpc)-\ln(min)}{\ln(max)-\ln(min)}\right]^{1/3}$$

নথিতে প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী গাণিতিক উদাহরণ:

ধরা যাক একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ডেটা নিম্নরূপ:

🗗 **প্রত্যাশিত আয়ু (Life Expectancy - LE):** ৭৫ বছর (সর্বোচ্চ মান: ৮৫ বছর)

🗗 **শিক্ষার গড় বছর (Mean Years of Schooling - MYS):** ১০ বছর (সর্বোচ্চ মান: ১৫ বছর)

🗗 **মাথাপিছু জাতীয় আয় (GNI per capita): ১০,০০০ ডলার (সর্বোচ্চ মান: ২৫,০০০ ডলার) ক্যালকুলেশন:**

১. আয়ু সূচক = $75 / 85 \approx 0.882$

২. শিক্ষা সূচক = $10 / 15 \approx 0.667$

৩. আয় সূচক = $10{,}000 / 25{,}000 = 0.400$

$$HDI = (0.882 \times 0.667 \times 0.400)^{1/3} \approx (0.235)^{1/3} \approx 0.611$$

বিশ্লেষণ: এই ০.৬১১ মানটি নির্দেশ করে যে, ওই নির্দিষ্ট জনসমষ্টির স্বাস্থ্যবিধি এবং জীবনযাত্রার মান "মাঝারি" স্তরের। সঠিক স্বাস্থ্যবিধি পালন প্রত্যাশিত আয়ু (LE) বাড়িয়ে সরাসরি HDI মানকে উন্নত করে।

৭. উপসংহার: একটি বৈজ্ঞানিক জীবনদর্শন (Conclusion)

পরিশেষে বলা যায়, স্বাস্থ্যবিধি কেবল সাবান দিয়ে হাত ধোয়া বা পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনো ধারণা নয়। এটি একটি সুসংগত, বিজ্ঞানসম্মত এবং বিশ্লেষণাত্মক জীবনধারা।

🗗 **এটি শারীরিক উৎকর্ষ** সাধন করে মেটাবলিজম এবং ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে।

🗗 **এটি মানসিক উৎকর্ষ** নিশ্চিত করে নিউরোট্রান্সমিটারের ভারসাম্য এবং স্ট্রেস হরমোন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

🗗 **এটি সামাজিক ও জাতীয় সমৃদ্ধি** নিশ্চিত করে SIR মডেলের মতো গাণিতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মহামারী রোধ করে।

স্বাস্থ্যবিধি হলো বিজ্ঞানের সেই প্রয়োগ, যা মানুষকে কেবল দীর্ঘায়ু দেয় না বরং সেই দীর্ঘ জীবনকে অর্থবহ এবং কর্মক্ষম করে তোলে। এটি ব্যক্তিগত সচেতনতা থেকে শুরু হয়ে একটি বৈশ্বিক সুস্থ সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

তথ্যসূত্রসমূহ (Academic References)

এই গভীর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাটি নিম্নলিখিত বিশ্ববিখ্যাত গবেষণা, সংস্থা এবং গাণিতিক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে:

১. World Health Organization (WHO), 2022: Hygiene and Public Health. Geneva: WHO Publications. (স্বাস্থ্যবিধির বৈশ্বিক মানদণ্ড এবং সংজ্ঞা নির্ধারণে প্রধান উৎস)।

২. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2021: Impact of Hygiene on Disease Prevention. Washington, DC. (সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধির প্রভাব সংক্রান্ত ডেটা) ।

৩. Kermack, W. O. & McKendrick, A. G., 1927: A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics. (মহামারী বিজ্ঞানের বিখ্যাত SIR মডেল-এর আদি উৎস) ।

৪. Murray, C. J. & Lopez, A. D., 1996: The Global Burden of Disease. Harvard School of Public Health (The Lancet). (বিশ্বজুড়ে রোগের প্রভাব এবং স্বাস্থ্যের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের আকর গ্রন্থ) ।

লেখক:
সুকল্যান বাছাড়
সিনিয়র কিউরেটর, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর।

উদ্ভিদের ভেষজ গুণে রোগ নিরাময়

হোসনে আরা পারভীন

আমাদের এই সুন্দর ধরিত্রী সেজেছে জীব এবং জড় জগত নিয়ে। জীব জগতে রয়েছে প্রাণী এবং উদ্ভিদ, যারা একে অপরের সাথে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। প্রাণী অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সবকিছুর জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের দেশে বন-জঙ্গল, গ্রাম-গঞ্জে প্রায় ছয় হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। জীবদেহের সকল কার্যকলাপ নানা প্রকার জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। যদি কোনো কারণে এই সব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে তবে তৈরি হয় নানা জটিলতা, যাকে বলা হয় রোগ-বালাই বা শারীরিক অসুস্থতা। জীবের অসুস্থতা দূর করে সুস্থ জীবন ফিরে পেতে নানা জৈব রাসায়নিক যৌগের ব্যবহার হয়। এটিই হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি।

আমাদের চারিপাশ বেষ্টন করে থাকা উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে নানা ধরণের নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ অর্থাৎ অ্যালকালয়েড, যা জীবদেহের রোগ-বালাই দমন করে শরীরকে সুস্থ সবল রাখে। যেসব উদ্ভিদের নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ অর্থাৎ অ্যালকালয়েড মানুষের রোগ-বালাই দমন করে শরীরকে সুস্থ সবল করে তোলে তাদের ভেষজ উদ্ভিদ বলে। এদেশের মানুষ প্রাচীনকাল থেকে এইসব ভেষজ উদ্ভিদ শারীরিক অসুস্থতায় ব্যবহার করে আসছে। রাজা-বাদশাদের রাজবিদ্যগণ ছিলেন প্রধান এবং সফল ব্যবহারকারী।

গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষ, কবিরাজ বা বৈদ্যের চিকিৎসাই নয়, পৃথিবী ব্যাপী হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদীয়, ইউনানি এমনকি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির মূল উপাদান হচ্ছে এই ভেষজ উদ্ভিদ। ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতির সুবিধা হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর কোনো খরচ নেই, থাকলেও খুব কম; অন্যদিকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। বাংলাদেশ পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে একটি। এই বিশাল জনগণের আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত লোকবল নেই অর্থাৎ মোট জনগণের একটা বিশাল অংশ আধুনিক চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত। আমাদের দুর্ভাগ্য যে নাগালের মধ্যে থাকা এই গাছগুলো আমরা চিনি না বা এর সঠিক মাত্রার ব্যবহারবিধি জানি না। গ্রাম-বাংলায় একটা প্রবাদ আছে সেটা হচ্ছে "চিনলে বড়ি না চিনলে মা বোনদের জ্বাল দেয়ার খড়ি"। তাই যে চিনতে পারে সে নিজেই নিজের চিকিৎসা করতে পারে।

তাই সঠিকভাবে চিনে নিয়ে অনেকে খুব সহজে রোগমুক্ত জীবন লাভ করতে পারে। উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করার সুবাদে এবং একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জীববিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদানে নিয়োজিত থাকায় উদ্ভিদের এই বিশেষ গুণের প্রতি আমার আগ্রহ। আর এই আগ্রহ থেকেই বিভিন্ন লেখক, চিকিৎসকের লেখা ভেষজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে পড়াশুনা এবং এর ব্যবহারবিধি নিজের সমস্যায় প্রয়োগ করা।

সকলের খুব পরিচিত কিছু বৃক্ষ, গুল্ম, বিরুৎ এবং এর সচিত্র নতুন পরিচয় এবং গুণাগুণ জানানোর জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সোনালু

নাম: সোনালু /বানর লাঠি বা বাঁদর লাঠি/বানরনড়ি বা রাখালনড়ি/সোদাল, সোন্দাল, সোনাইল, আমলতা।

বৈজ্ঞানিক নাম: *Cassia fistula Linn.*

ইংরেজি নাম: Golden shower tree, Purging cassia, Indian laburnum or Pudding-pipe tree.

সংস্কৃত নাম: আরগ্বধ, অমলতাস, আরোগ্যশিম্বী, কুণ্ডল, কৃতমালক, কর্ণিকার, কর্ণী, কলিঘাত, চতুরঙ্গুল, স্বর্ণাঙ্গ, হেমপুষ্প।

আবাস: হাজার বছর আগেও এ গাছ আমাদের উপমহাদেশে ছিল। এর আদিনিবাস হিমালয় অঞ্চল ধরা হলেও বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও মায়ানমার অঞ্চল জুড়ে রয়েছে এর বিস্তৃতি। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস ও কুইন্সল্যান্ডের উষ্ণ অঞ্চলে এদের প্রচুর দেখা মেলে। বাংলাদেশে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড-কুমিরা পাহাড়ী অঞ্চলে এ গাছটি দেখা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এবং সড়ক-মহাসড়ক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, বন জঙ্গলে গ্রামীণ রাস্তার ধারে ছোট বড় সোনালু গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

পরিচিতি: সোনালু বা বাঁদর লাঠি পাতাঝরা মাঝারি আকৃতির একটি চমৎকার ফুলের বৃক্ষ। এটি ৮ থেকে ৯ মিটার উঁচু হয়। সোনালী রঙের ফুলের বাহার থেকেই 'সোনালু' নামে নামকরণ করা হয়েছে। হলুদ বরণ এ ফুল দেখতে যেমন আকর্ষণীয় তেমনি আছে তার বাহারি অনেক নাম। কিশোরীর কানের দুলের মতো বৈশাখী হাওয়ায় দুলতে থাকে হলুদ-সোনালি রঙের থোকা থোকা ফুল। ফুলের ফাঁকে দেখা যায় লম্বা লম্বা গাঢ় বাদামি ফল। উদ্ভিদবিষয়ক একাধিক জার্নালে সোনালু গাছে বর্ণনা পাওয়া যায়। সোনালু গাছ আকারে মাঝারি ধরণের সাদা বাকল যুক্ত, কাঠের রং ইটের মতো লাল। ডালপালা ছড়ানো-ছিটানো। দীর্ঘ মঞ্জুরিদণ্ডে ঝুলে থাকা ফুলগুলোর পাপড়ির সংখ্যা পাঁচটি। সবুজ রঙের একমাত্র গর্ভকেশরটি কাণ্ডের মতো বাঁকানো। এ গাছের ফল ৩০-৫০ সে.মি. লম্বা, কাঁচা অবস্থায় সবুজ, পাকলে কালচে-লাল বা গাঢ় খয়েরী বর্ণের হয়। ফলগুলো গাছে ঝুলে থাকে। লাঠির মতো গোল পাকা ফলের ভেতর থেকে পয়সা আকৃতির আবরণযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় রস বা মজ্জা পাওয়া যায়। গাঢ় সবুজ রঙের পাতাগুলো যৌগিক, মসৃণ ও ডিম্বাকৃতির।



সোনালু: Cassia fistula Linn

যখন ফুল ফোটে তখন এই গাছকে দৃষ্টি না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার কারও সাধ্য নেই। থোকা থোকা সোনারঙা হলুদ ফুল দেখে সবার মন-প্রাণ প্রশান্তিতে ভরে যায়। সোনালুর ফুল, ফল ও পাতা বানরের খুব প্রিয়। এ জন্য এর আরেক নাম বান্দরলাঠি।

ভেষজ গুণ:

বানরলাঠি অনেক উপকারী একটি উদ্ভিদ। বিজ্ঞানীদের মতে আয়ুর্বেদিক, ইউনানি এবং চাইনিজ ট্রাডিশনাল মেডিসিনে এই উদ্ভিদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পাতা, ফুল, গাছের ছাল বা মূলের ছাল, ফলমজ্জা ও খোসা ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

১। সোনালুর পাতা জীবাণুনাশকতার জন্য খুবই প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন চর্মরোগ, ক্ষত শুকাতে, শরীরের ইনফেকশন রোধে, কীটপতঙ্গের কামড় ও চামড়ায় জ্বালা-পোড়া বন্ধ করতে, গ্যাস্ট্রিক, অ্যাজমা ও ডায়রিয়া রোধে এর পাতার রস সেবন করা হয়। পাতার রস গরম করে বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয়। টনসিলের সমস্যায় ফুলা কমাতে এই উদ্ভিদের পাতা গরম করে ছেক দেওয়া হয়।

২। কোষ্ঠবদ্ধতা বা কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে: বানরলাঠির ফলমজ্জা একটি অতি উৎকৃষ্ট জোলাপ। তাই এটি কোষ্ঠবদ্ধতায় (বিশেষ করে বৃদ্ধকালের) রোগীদের জন্য, ফলের মজ্জা ৬/৭ গ্রাম পরিমাণ নিয়ে এক কাপ গরম দুধে বা পানিতে ভাল করে গুলে পরিষ্কার পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। ই"ছা করলে এর সাথে একটু চিনি বা মধু মিশিয়ে নেওয়া যায়। এটি প্রত্যহ সকালে খেলে কোষ্ঠাবদ্ধতা দূর হবে।

৩। বাত ও গেঁটে বাতে ফলের শাঁস ব্যবহার করলে উপকার হয় বলে উল্লেখ আছে। দুধের সাথে মণ্ড করে গেঁটে বাতে প্রলেপ দিলে উত্তম ফল লাভ করা যায়। চিরঞ্জীব বা আমবাত সমস্যার জন্য ৬/৭ গ্রাম পরিমাণ পাতা বেঁটে ২/১ চামচ ঘি-এ ভেজে পানিসহ সকালে খাওয়ায় উপকার হয়।

৪। শূল বেদনা, অগ্নিমান্দ্য রোগে পাকা ফলের শাঁস ব্যবহৃত হয়। ৫/৬ গ্রাম শাঁস পানিতে মিশিয়ে খেলে শূল বেদনা কমে যাবে এবং অগ্নিমান্দ্য, পেট ফাঁপা, খাবারের রুচি না থাকা ইত্যাদি রোগও উপশম হয়।

৫। টনসিলের রোগে এটি একটি উত্তম ও অব্যর্থ ভেষজ। দুটি বানরলাঠি ফল চুর্ণ করে পরিমাণ মতো দুধে সিদ্ধ করার ফলে এটি কাই বা মণ্ডের মতো তৈরি হবে। এই মণ্ড টনসিলের উপর প্রলেপ দিতে হবে। একটি প্রলেপ শুকিয়ে গেলে নতুন করে প্রলেপ দিন। এতে ২/৩ দিনের মধ্যে সম্পুর্ণরূপে সন্থতা পাওয়া যাবে।

৬। ক্ষারমেহ রোগেও এর উত্তম ব্যবহার আছে। ক্ষারমেহ অর্থাৎ প্রস্রাব করলে সেখানে সাদা তলানী পড়ে এবং ঝাঁঝালো গন্ধ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বানরলাঠির পাতা বা মূলের এক চামচ রসের সাথে ৬/৭ চামচ গরম পানি মিশিয়ে ঠান্ডা হলে সকাল-বিকাল খেতে হবে। এতে করে কয়েকদিনের মধ্যেই ক্ষারমেহ কমে যাবে।

৭। প্রসব কালে বানরলাঠির ৫/৬টি বীজ জাফরান, চিনি ও গোলাপ জলে মিশিয়ে খেলে প্রসব যন্ত্রনা আরম্ভ হয় ও ভালভাবে প্রসব হয় বলে উল্লেখ আছে। ঋতুস্রাব নিঃসরণে ক্ষেত্রে ১০-১২ গ্রাম ফলের খোসা (আধাচূর্ণ) ২ কাপ পানিতে ভিজিয়ে পরবর্তীতে জ্বাল করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে নির্যাসটুকু প্রত্যহ ২-৩ বার সেব্য।

৮। এটির ফুলে এন্টি-ফাংগাল (Ringworm রোগ) ও এন্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুনাগুণ রয়েছে। এর বীজ এন্টি-ক্যান্সার ও এন্টি-টিউমারের জন্য খুবই জনপ্রিয়। কসমেটিকস ইন্ডাস্ট্রিতে রূপ ধরে (Anti-ageing) রাখার জন্য এর বীজ ব্যাবহার করা হয়। এর বীজ থেকে প্রাপ্ত রস খাবারের গুনাগুণ, সেলফ-লাইফ (Shelf life) বৃদ্ধি ও খাবার প্রিজারভেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

৯। বিভিন্ন ফ্লু জনিত জ্বর ও ঠাণ্ডার জন্য এর শেকড় খাওয়া হয়। এটি ডায়রিয়া এবং বহুমূত্র রোগে ব্যবহৃত হয়।

সতর্কতা: এই উদ্ভিদ প্রচুর অ্যালকালয়েড সমৃদ্ধ তাই নির্দিষ্ট মাত্রার অধিক সেবন করা যাবে না।

Chemical Composition:

সোনালুর ফলে থাকে- Sugar, gluten, calcium oxide, alkaloids, Emodin, Aloe-emodin, flavonoids and a colouring agent.

মূল এবং বাকলে: 10-20% tannin, Anthraquinone, antibacterial, antioxidant, hepatoprotective, hypoglycemic, hepatoprotective গুণাগুণ রয়েছে।
পাতা এবং ফুলে: Glucoside, Anthraquinones, Sennidins, Glycosides, Tannins, steroid, alkaloids, glycosides, lipids, tannin, saponin, terpenoids, reducing sugar, flavonoids, flavon বিদ্যমান।

জারুল

স্থানীয় নাম: ফুরুশ, বাংলার চেরি, জলধর, তিনিশ, চক্রী, রাণীর রাজকীয় ফুল।

বৈজ্ঞানিক নাম: Lagerstroemia speciosa.

ইংরেজি নাম: Giant Crape-myrtle, Queen's Crape-myrtle, Banaba Plant, Pride of India.

জারুল

"এই ছবিটি চেনা।
মনের মধ্যে যখন খুশি
এই ছবিটি আঁকি
এক পাশে তার জারুল গাছে
দুটি হলুদ পাখি।"

- আহসান হাবীব



জারুল: Lagerstroemia speciosa

বসতি: বৃক্ষ জাতীয় জারুল গাছের আদি নিবাস শ্রীলংকা হলেও বাংলাদেশে এই গাছটি এসেছে ভারত থেকে। এটি ভারতীয় উপমহাদেশের নিজস্ব বৃক্ষ। বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও চীন, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলে জারুল গাছের দেখা পাওয়া যায়। জলাভূমির আশপাশের জনপদেই এ গাছকে বেশি দেখা যায়। এটি একটি পানি পছন্দ প্রজাতি। তবে এটি যেমন জলাভূমিতে বেড়ে ওঠে, তেমনি এ গাছ শুকনো এলাকায়ও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। অনেক শহর ও পাহাড়ি এলাকায়ও জারুলের দেখা মেলে।

পরিচিতি: পাতাঝরা এই বৃক্ষটি শীতকালে পত্রশূন্য থাকে। বসন্তে নতুন গাঢ় সবুজ পুরু ও বেশ প্রশস্ত ধরনের পাতা গজায়। গাছের উচ্চতা ১০ থেকে ২৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। গ্রীষ্মের শুরুতে জারুলের ফুল ফুটতে থাকে। শরৎকাল পর্যন্ত ফুল ফুটতে দেখা যায়। গাছের শাখা-প্রশাখা ও কাণ্ড শক্ত। শাখা প্রশাখার অগ্রভাগ থেকে মঞ্জুরিদণ্ড বের হয়। এতে সবৃন্তক অসংখ্য ফুল ফোটে। মঞ্জুরিদণ্ডের নিচ থেকে প্রথম ফুল ফোটা শুরু হয়ে বোঁটার আগার দিকে ধীরে ধীরে ফুল ফোটে। এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত ফুল আসে। গাছ ফুলে ছেঁয়ে গেলেও গন্ধহীন হওয়ায় চারপাশে তেমন সুগন্ধি ছড়ায় না তবে এর বেগুনি, নীল, মেজেন্টা, গোলাপি, সাদা দৃষ্টিনন্দন রং ও রূপের শোভায় সবাই মুগ্ধ হয়, চোখ আটকে যায়। পাপড়ির নমনীয় ও কমলতা হৃদয় ছুঁয়ে যায় প্রকৃতিপ্রেমীদের। ফুল ৫ থেকে ৭ সেন্টিমিটার চওড়া হয় এবং হালকা সোনালি পুংকেশর থাকে। ফল ডিম্বাকার, শক্ত ও বিদারি। বীজ ১ সেন্টিমিটার চওড়া, পাতলা বাদামি রঙের। বীজে থেকেই এর বংশবৃদ্ধি হয়। জারুল ফুলের পাপড়ি ভাঁজ খেলানো বা কোঁচকানো এবং চেরিফুলের মতো। তাই একে জায়ান্ট ক্রেপ মার্টল এবং কেউ কেউ বাংলার চেরি বলে।

ভেষজ গুণ:

জারুল শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না, এ গাছের রয়েছে নানা ভেষজ গুণ। প্রচলিত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় এটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। গাছটির নির্দিষ্ট অংশ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে ত্বকের রোগ, জ্বর ও বিভিন্ন সংক্রমণের প্রতিকার হিসাবে এটির ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। আধুনিক গবেষণায়ও এর গুণাগুণ প্রমাণিত। এই গাছের পাতা, ছাল, ফুল এবং মূল থেকে প্রাপ্ত উপাদান অনেক প্রাকৃতিক ঔষধি গুণ বহন করে। ভেষজ চিকিৎসকগণ সেইসব উপাদান নানা রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করেন।

১। অনিদ্রা সবচেয়ে সাধারণ ঘুমের রোগ। ভেষজ উপায়ে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পাওয়া যায়। ইনসমনিয়া বা অনিদ্রা দূর করার অন্যতম ভেষজ হল আমাদের অতি পরিচিত জারুল গাছ। যাদের ঘুম না হওয়া জনিত সমস্যা আছে তারা জারুল গাছের পাতা ও মূল চূর্ণ করে গরম পানির সাথে রাতের বেলা প্রতিদিন শোয়ার আগে নিয়মিত খেলে অনিদ্রা কেটে যায় এবং ভালো ঘুম হয়।

২। জারুল গাছের পাতা থেঁতো করে মধুর সাথে মিশিয়ে খেলে কাশি উপকার পাওয়া যায়। তাছাড়া কাশি হলে এই গাছের শিকড় সিদ্ধ করে সেই পানি মধুর সাথে মিশিয়ে কয়েকদিন খেলে কাশি ভালো হয়।

৩। অজীর্ণতায় পাতার রস খেলে আমাশয় ভালো হয়। পাতা সিদ্ধ করে এই ক্বাথ সেবন করলে জ্বর দ্রুত সেরে যায়।

৪। বাতের ব্যাথা দূর করতে জারুল গাছের পাতা বেটে প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়।

৫। জারুলের বীজ, ছাল, পাতার রস রক্তে সুগারের মাত্রা কমাতে পারে, তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে এটা ব্যবহার করা হয়।

৬। জারুল পাতার চা বেশ সুস্বাদু, পাতা থেকে চা বানানোর ব্যাপারে এগিয়ে আছে ফিলিপাইন, তাইওয়ান এবং জাপান। ফিলিপাইনে জারুল গাছের অন্যান্য অংশও ব্যবহৃত হচ্ছে। জাপানিজ ফারমাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো টন পরিমান জারুলের পাতা আমদানি করে স্লিমিং চা (Slimming tea) তৈরির জন্য। ফিলিপাইনের Department of Health জারুল গাছকে তাদের ৬৯টি হারবাল উদ্ভিদের মধ্যে একটি প্রধাণ ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

৭। জারুলের পাতার চা কিডনী সমস্যাতে ব্যবহার করে উপকার পাওয়া গেছে। এটা শুধুমাত্র ওজন কমানোর কাজই করে না, কোলেস্টেরল এবং হাইপারটেনশন নিয়ন্ত্রনেও যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

অন্যান্য ব্যবহার: ভিয়েতনামে জারুলের কচি পাতা সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। জারুল গাছ থেকে কাঠ করতে চাইলে কমপক্ষে ২৫ থেকে ৩০ বছর সময় লাগে। এর কাঠের রং লালচে ধরনের। কাঠগুলো বেশ শক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী। জমি চাষের লাঙল, ঘর নির্মাণ, নৌকা ও আসবাবপত্র তৈরীতে এই কাঠ ব্যবহার করা যায়। জারুল গাছ

থেকে প্রাপ্ত কাঠ, তেল ও অন্যান্য উপাদান বাজারে মূল্যবান। গ্রামের ছোট ছোট উদ্যোগীরা এই গাছের উপাদান ব্যবহার করে স্থানীয় শিল্পে নতুন নতুন পণ্য তৈরি করে থাকেন। কাঠের দৃঢ়তা ও টেকসই বৈশিষ্ট্য এটি নির্মাণ কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে। এছাড়াও কিছু অঞ্চলে জারুল গাছ থেকে প্রাপ্ত উপাদান ঔষধি ও খাদ্যসামগ্রী তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। স্থানীয় বাজারে এর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে এবং এ কারণে এটির দাম ও বাজার মূল্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Chemical Composition:

জারুল গাছের বিভিন্ন অংশের নির্যাসে বিচ্ছিন্ন রাসায়নিক যৌগগুলির মধ্যে রয়েছে: Tannins, Triterpenoids, Ellagic acid derivatives, Sterols, Maslinic acid and Mrgosterol peroxide. Corosolic acid, lager-stroemin, phloesin B and resinin A. Ellagitannis, alamine and menthol. পুরোনো পাতায় আছে hypoglycemic, যা অনেকটা ইনসুলিনের মতো কাজ করে থাকে।

আকন্দ

নাম: আকন্দ

স্থানীয় নাম: অর্ক, আকন ফুল, বাংলাদেশে এটি আকন্দ নামে পরিচিত হলেও ভারত ও অন্যান্য অঞ্চলে একে মাদার, আরকা বা সুবর্ণপত্র নামেও ডাকা হয়।

বৈজ্ঞানিক নাম: ***Calotropis gigantea***

ইংরেজি নাম: Crown flower, Apple of Sodom, Swallow Wort, Stabragh, Kapok tree, King's crown

প্রাপ্তিস্থান: আকন্দ বা অর্ক বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে নিরস পতিত জমিতে, রাস্তার পাশে, বাঁধের ধার, পুকুর পাড়, রেললাইনের ধারে ও গ্রামে কাঁচা রাস্তার পাশে, বিশেষ করে শুকনো স্থানে ভালো জন্মে, পারিবারিক বাগান ও ভেষজ বাগানে আকন্দ চোখে পড়ে। এছাড়া ফসলি জমির আইলে জীবন্ত বেড়া হিসেবে অনেক চাষি আকন্দ গাছ রোপণ করে থাকেন। আগের দিনগুলোতে উন্মুক্ত পতিত জমিতে এই মূল্যবান ভেষজ উদ্ভিদ দেখা যেত, অথচ দিন দিন তা দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে। সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকায় এ গাছ পাওয়া যায়। তাছাড়া ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ভারত, চীন, পাকিস্তান, নেপালে আকন্দ গাছ পাওয়া যায়।

স্বরূপ: আকন্দ এক প্রকার গুল্ম জাতীয় ঔষধি উদ্ভিদ। এই গাছ সাধারণত: ৩-৪ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। দেখতে ধুসর সবুজ রঙের এবং কান্ড শক্ত ও কচি ডাল লোমযুক্ত। পাতা সরল, সবুজ, মোটা, অনেকটা বট পাতার মতো, প্রতিমুখ, তীর্যকাপন্ন, স্পর্শে রাবারের মতো অনুভূত হয়। শিরাবিন্যাস স্পষ্ট, জালিকাকার। পাতা ৪ থেকে ৮ ইঞ্চি লম্বা, উপরিভাগ মসৃণ এবং নীচের দিক তুলোর মতো, সহজে ভাঙ্গে না। বৃন্ত ক্ষুদ্র এবং হৃদপিন্ডাকার। আমাদের দেশে শ্বেত আকন্দ ও লাল আকন্দ এই দুই ধরনের গাছ দেখা যায়। শ্বেত আকন্দের ফুলের রং সাদা ও লাল আকন্দের ফুলের রং বেগুনি হয়ে থাকে। সাদাটে বেগুনি আকন্দ গাছই বেশি দেখা যায়।




হালকা সুগন্ধীযুক্ত এই ফুলে পাঁচটা পাঁপড়ি থাকে, পাতার মতো ফুলের পাঁপড়িও পুরু এবং মোমের মতো। পুংস্তবক এবং স্ত্রীস্তবক একত্রে রাজমুকুটের মতো গঠন তৈরি করে বলে এর এক নাম Crown flower বা King's crown. ফুলের ব্যাস এক থেকে দেড় ইঞ্চি। ফল সবুজ রঙের, ডিম্বাকৃতি, টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো কিছুটা বাঁকা। ভেতরে তুলা থাকে এবং তুলার ভেতরে হালকা বীজ থাকে। বীজের বর্ণ ধূসর কিংবা কালচে হয়ে থাকে। গাছের পাতা ছিড়লে কিংবা কান্ড ভাঙলে দুধের মতো সাদা ঘন কষ (তরুক্ষীর) বের হয় যা এনজাইম সমৃদ্ধ। আকন্দ গাছ সাধারণত বেলে দোআঁশ মাটিতে ভালো জন্মায় এবং এতে খুব একটা সেচ বা পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। এর বিস্তার এতটাই সহজ যে একবার বীজ পড়লেই বছর বছর গজিয়ে ওঠে।

ভেষজ গুণ ও লোকজ ব্যবহার:

বহুগুণে গুণান্বিত আকন্দ গাছের ফুল, পাতা, আঠা, শিকড়, কাণ্ড বিভিন্ন চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ওষুধ হিসেবে আকন্দের ভেষজ ব্যবহার বিষয়ে আয়ুর্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসায় উল্লেখ রয়েছে। হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, দাঁতের ব্যাথা, গর্ভপাত, খোসপাঁচড়া, অ্যাকজিমা, বহুমূত্র রোগ, পা মচকালে, পেট জ্বালাপোড়া, হজম শক্তি, ফোড়া, ব্রণ, বিছা কামড়ালে, পাকস্থলীর ব্যাথা, হজমকারক, বায়ুনাশক, উদ্দীপক, পাচক, বিষনাশক, ফোলা নিবারক, প্লীহা, দাদ, শোথ, অর্শ, ক্রিমি, ব্রণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, বুকে কফ, শরীরের কোনো স্থানে ক্ষত হলে আকন্দ গাছের পাতা, ছাল, ফুল, ফল, মূল ও কষ রোগ নিরাময়ে ব্যাপক ব্যবহার হয়।

১। আকন্দ আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে মূলত হাঁপানি বা অ্যাজমা রোগের চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য পরিচিত। অনেক ভেষজ শাস্ত্রে পাওয়া যায় যে, হাঁপানি রোগের মহৌষধ হলো আকন্দ পাতা। এছাড়া আকন্দের শিকড়ের ছাল প্রথমে গুড়া করে তারপর আকন্দের আঠায় ভিজিয়ে রেখে পরে শুকিয়ে নিতে হবে। এর পর তা চুরুট বানিয়ে ধুমপান করলে শ্বাসকষ্ট ভাল হয়। ১৪টি আকন্দ ফুলের মাঝের চৌকো অংশটি নিয়ে এর সাথে ২১টি গোলমরিচ একসঙ্গে বেটে ২১টি বড়ি বা ট্যাবলেট বানিয়ে প্রতিদিন সকালে পানি দিয়ে ১টি করে খেলে হাঁপানি রোগের উপশম হয়।

২। আকন্দের পাতার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলো এর ব্যাথা নিরাময় ক্ষমতা। শরীরের কোনো অংশে ব্যাথা হলে বা ফুলে গেলে এটি খুবই দ্রুত কাজ করে। এজন্য শরীরের কোথাও আঘাত লেগে ফুলে উঠলে আকন্দ পাতা বেঁধে রাখলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। অথবা খেলতে গিয়ে বা পড়ে গিয়ে পা মচকে গেলে আকন্দ পাতা প্রথমে গরম করে ব্যাথা স্থানে সেক দিলে ব্যথা কমে যায়।

৩। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও অম্লরোগে সতেজ আকন্দ পাতার সঙ্গে এর আট ভাগের এক ভাগ ওজনের খাঁটি সৈন্ধব লবন হাঁড়ির মধ্যে নিয়ে মুখ বন্ধ করে অন্তর্ধূমে পোড়াতে হবে। তারপর ভিতরের পোড়া কালো মিশ্রনটি গুঁড়া করে আধা গ্রাম করে খাওয়ার পরে পানি দিয়ে খেতে হবে।

৪। চরক সংহিতার মতে যাদের অর্শের বলি বাইরে বেরিয়ে রয়েছে, তারা ওই পাতার চূর্ণ আগুনে দিয়ে সেই ধুম লাগালে কয়েক দিনের মধ্যেই তা চুপসে যায়।

৫। শরীরের কোনো স্থানে ক্ষত হলে সেই স্থানটিতে আকন্দ পাতার সেদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হয়। এতে পুঁজ হয় না। আকন্দের আঠার সঙ্গে ৪ গুণ সরিষার তেল মিশিয়ে গরম করে এই গরম তেলের সঙ্গে কাঁচা হলুদের রস মিশিয়ে খোস পাঁচড়ায় বা ঘায়ে দিলে তা ভালো হয়ে যায়।

৬। অনেকের সারা গা ছুলিতে ভরে যায়। আবার বয়সকালে গালে ব্রণ হলে তা থেকে কালো দাগ পড়ে। এই সমস্যা সমাধানে তিন গ্রাম হলুদের গুঁড়ো এবং আকন্দের পাঁচ থেকে ছয় ফোঁটা আঠা মিশিয়ে গোসলের এক ঘণ্টা আগে লাগালে দু'টো রোগের উপকার হয়। আমি খাঁটি মধুর সাথে সমপরিমাণ আকন্দের আঠা মিশিয়ে মুখে উঠা মেছতায় লাগিয়ে উপকার পেয়েছি।

৭। নিউমোনিয়াজনিত ব্যাথায় আকন্দ পাতার সোজা দিকে ঘি মেখে ব্যাথার জায়গায় বসিয়ে লবনের পুটলি দিয়ে শেঁক দিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। বুকে সর্দি বসে হাঁসফাঁস করলে বুকে পুরনো ঘি মালিশ করে আকন্দ পাতা গরম করে বুকে সেক দিলে সর্দি উঠে আসে।

৮। অথর্ববেদে আছে আকন্দ গাছের পাতা ব্রণ, ফোঁড়া ফাটাতে সাহায্য করে। আকন্দ পাতা দিয়ে ফোঁড়া বা ব্রণ চেপে বেঁধে রাখলে অতি সহজে পেকে ফেটে যায়।

৯। বিছা বা অন্যান্য পোকা-মাকড়ের কামড়ে আকন্দের রস লাগালে ব্যাথা এবং বিষনাশে বিশেষ কার্যকরী। এছাড়াও পোকামাকড় কামড়ালে জ্বালা-পোড়া কমাতে আকন্দ পাতা ব্যবহার করলে উপশম হয়।

১০। আকন্দ গাছের পাতা ও দুধালো রস প্রাচীনকালে বিভিন্ন ত্বকের রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার হতো। বিশেষ করে খোসপাঁচড়া, একজিমা বা চুলকানি সমস্যায় আকন্দের রস খুব কার্যকর। আক্রান্ত স্থানে সরাসরি আকন্দের পাতা বেঁধে দিলে ত্বকের প্রদাহ ও চুলকানি দূর হয়। ১৬ ফোঁটা আকন্দের আঠা, সমপরিমাণ তিল-তেল এবং

এক ফোঁটা হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে মলম তৈরি করে রাতে ঘুমানোর আগে মাত্র একবার লাগালে নিশ্চিত সেরে যাবে।

১১। ৫ গ্রাম আকন্দ গাছের শেকড়ের ছাল, পরিষ্কার পানি দিয়ে বেটে, তার পুরো রসটা একটা কাঁচের গ্লাসে রাখতে হবে। এরপর ওই রসে সরষে দানার পরিমাণে আফিম মিশিয়ে সকালে একবার এবং সন্ধ্যায় আরেকবার খেলে রোগী অবশ্যই ভাল হবে। তবে রোগীর সামান্য তন্দ্রাভাব দেখা দিতে পারে এতে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

১২। আকন্দ পাতার উপরের পিঠে সরিষার তেল মাখিয়ে পাতাটি অল্প গরম করে পেটের উপর রাখলে বা শেঁক দিলে পেট কামড়ানো বা পেট জ্বালা বন্ধ হয়। আকন্দ গাছের মূলের ছাল ভালভাবে বেটে প্রলেপ দিলে গোদ রোগী আরাম বোধ করে।

১৩। আকন্দের পাতা ফোলাজনিত সমস্যা যেমন আথ্রাইটিস বা বাতের ব্যাথায় প্রয়োগ করলে দ্রুত উপশম হয়। এটি প্রদাহ হ্রাস করে এবং ব্যাথা কমাতে সহায়তা করে। আকন্দ গাছের আঠায় সামান্য সরষে তেল মিশিয়ে মালিশ করলে বা রাতে ঘুমানোর সময় আক্রান্ত অংশটি আকন্দ পাতা দিয়ে ঢেকে তারপর কাপড়ের ফালি দিয়ে বেঁধে রাখলে ফোলা এবং যন্ত্রণা দুটোই কমে যাবে।

১৪। আকন্দ গাছের মূলের রস জ্বর উপশমে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে সাধারণ সর্দি-কাশি এবং সংক্রামক জ্বরের ক্ষেত্রে আকন্দের মূল থেকে তৈরি ওষুধ শরীরের তাপমাত্রা কমাতে সহায়তা করে। এছাড়াও আকন্দ পাতা সরাসরি ত্বকে প্রয়োগ করলে পেশির ব্যাথা কমায়।

১৫। আকন্দের কষ তুলায় ভিজিয়ে লাগালে দাঁত ব্যাথা দুর হয়। কানের যন্ত্রণায় আকন্দ পাতায় পুরনো গাওয়া ঘি মাখিয়ে সে পাতাকে আগুনে ভালোভাবে সেঁকে নিতে হয়। এর পর পাতাকে নিংড়ে কানে দিয়ে তুলো দ্বারা কান বন্ধ করা দরকার। মাত্র দুদিন প্রয়োগ করলেই যন্ত্রণার উপশম হবে।

অন্যান্য ব্যবহার: আকন্দের তুলা বালিশ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আকন্দ গাছের শুকনো ডালপালা গ্রামে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। গাছের দুধ ও পাতা কীটপতঙ্গ দমন করে। ফলে কৃষকরা পরিবেশ বান্ধব কীটনাশক হিসেবে এটি ব্যবহার করেন। আকন্দের দুধের মতো রসকে প্রাকৃতিক কীটনাশক হিসেবে ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। এটি জোঁক, পোকামাকড় ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। মশা তাড়াতে ও ইঁদুরের উৎপাত কমাতে শুকনো আকন্দ পাতা পুড়িয়ে তার ধোঁয়া দিলে মশা ও ইঁদুরের উপদ্রব দূর হয়। কিছু অঞ্চলে আকন্দ গাছের তরুণ পাতা পশুদের খাদ্য হিসেবে দেওয়া হয়। তবে দুধযুক্ত অংশ সরাসরি না খাওয়ানোই ভালো।

আকন্দ গাছের ফুল ও পাতার অনন্য রূপ দিয়ে সৌন্দর্য বর্ধনেও ব্যবহার হয়। আকন্দ গাছের গভীর শিকড় মাটি আটকায় এবং ভূমি ক্ষয় রোধ করে। ফলে নদীর পাড়ে ও খাস জমিতে এটি বিশেষ উপকারী। এই গাছ অনেক সময় ফসলের ক্ষতি রোধে বা জমি সংরক্ষণের জন্য বেড়া হিসাবে লাগানো হয়। ফলে কৃষি ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় এর গুরুত্ব বেড়েছে।

Chemical Composition:

আকন্দের পাতায় এনজাইম সমৃদ্ধ তরুক্ষীর বিদ্যমান। এতে বিভিন্ন Glycosides, beta-amyrin and stigmasterol আছে। কাণ্ড ও পাতায় সাদা দুধের মতো তরল পদার্থে থাকে Cardiac glycosides এবং alkaloids জাতীয় রাসায়নিক উপাদান। এছাড়াও রয়েছে bioactive উপাদান যা antiseptic, anti-inflammatory এবং antifungal হিসেবে কাজ করে।

সতর্কতা: গাছটির বিষাক্ত অংশ হলো পাতা ও গাছের কষ বা এনজাইম সমৃদ্ধ তরুক্ষীর যা ত্বকে লাগলে জ্বালা ও এলার্জি হতে পারে। এইকষ ভীষণ রেচক, গর্ভপাতক, শিশু হন্তারক। শিশু ও গর্ভবতী নারীদের সাবধান থাকতে হবে। আকন্দ গাছ বিষাক্ত, এর পাতা বা দুধ কাঁচা খাওয়া উচিত নয়। এটার কিছু অংশ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে পারে, বিশেষ করে উচ্চ মাত্রায় ব্যবহার করা হলে। তাই ঔষধি কাজে ব্যবহারের আগে যথাযথ পরিমাণ নির্ণয় করে সঠিক মাত্রায় ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সার্বিক বিবেচনায় আকন্দ গাছ মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য এক অনন্য উপকারী ভেষজ উদ্ভিদ।

উলটকম্বল

নাম: উলটকম্বল, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে একে ওলট কম্বল বলা হয়। এর আকর্ষণীয় মেরুন ফুল নীচ দিকে ঝুলে থাকলেও ফল থাকে উপরের দিকে খাঁড়া, এ জন্যই উলট (উল্টো), পরিপক্ক ফল ফেঁটে ভিতরের কম্বলের ন্যায় লোমশ অংশ পরিস্ফুটিত হয় তাই নাম উলটকম্বল।

স্থানীয় নাম: বত্তা, উলুটপুলুট, ভূতুম গাছ নামে পরিচিত। কেউ কেউ আবার বলে 'উল্টো কমল' কারণ ফুল দেখতে কিছুটা পদ্মফুলের মতো, কিন্তু উলটা হয়ে থাকে। মুখে মুখে উল্টো কমল হয়ে গেছে উলটকম্বল।

বৈজ্ঞানিক নাম: ***Abroma augusta***

ইংরেজি নাম: Devil`s Cotton গাছের ছালে পাটের বা রেশমের মত আঁশ থাকে যদ্বারা বেশী বাড়াবাড়ি করলে Devil কর্তৃক শয়তানি মুলক চুলকানির উদ্রেক হতে পারে, এই কারণে ইংরেজিতে এই গাছকে Devil`s Cotton বলা হয়।

প্রাপ্তিস্থান: উলটকম্বল গাছ মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে পাওয়া যায় বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত এবং শ্রীলঙ্কায়। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গলে এবং সারাদেশে ছায়াযুক্ত স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মায়। উলটকম্বল গাছ চাষের জন্য উর্বর মাটি প্রয়োজন হয়। সাধারণত দোঁআশ মাটি এ গাছের জন্য আদর্শ। যেসব এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং সূর্যের আলো পর্যাপ্ত পাওয়া যায় এমন স্থান উলটকম্বল চাষের জন্য উত্তম। বাংলাদেশের বনাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলে গাছটির প্রাকৃতিক বিস্তারের সাথে সাথে কৃষকরা এটিকে বাড়ির আশেপাশে বা কৃষিক্ষেতে লাগানো শুরু করেছে।

প্রকৃতি: বহুবর্ষজীবী উলটকম্বল গাছ একটি চিরহরিৎ ঝোপালো ধরনের গাছ। এটি সাধারণত ২ থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয় তবে খুব একটা মোটা হয় না। ছোটো অবস্থায় একে স্থলপদ্ম গাছের মতো মনে হয়। গাছটির পাতা বড় ও সরল এবং প্রান্ত কিছুটা খাঁজকাটা থাকে। লম্বা বোঁটাসহ গাছের শাখার গোড়ার পাতা হৃৎপিণ্ডের মতো

দেখায়, তবে পাতার সামনের দিকটা ক্রমশ সরু, উজ্জ্বল সবুজ রঙের। পাতা ১০-১৫ সে. মি. লম্বা ও ১০-১৫ সে. মি. চওড়া। ফুল-ফলসহ ডগার পাতাগুলো লম্বা আকৃতির বাসক পাতার মতো। অর্থাৎ একই গাছে দুইরকমের পাতা দেখা যায়। পাতার বোঁটা ও কচি ডাল খয়েরি লাল, গাছের বাকল শক্ত আঁশযুক্ত, পানিতে ভেজালেও নষ্ট হয় না। নির্দিষ্ট বয়সে গাছে ফুল ফোটে। দেখতে বেশ মনোরম, রং খয়েরি ও কালোয় মেশানো গাঢ় মেরুন রঙের ফুল, হঠাৎ দেখলে রঙিন প্রজাপতি বলে মনে হয়।

পাপড়ি পাঁচটি, গাছের কচি শাখায় ফুল ফোটে। গ্রীষ্ম থেকে ফুল ফোটা শুরু হয়ে শরৎকাল পর্যন্ত ফুল ফোটে এবং শীতকালেও গাছে ফুল দেখা যায়। ফুল শেষে ফল হয়। ফল পঞ্চকোণাকৃতির, প্রথমে সবুজ রং এবং পরে পরিপক্ব ফল কালো অথবা ধূসর বর্ণের হয়। পরিপক্ব ফল ফেঁটে যায়। তখন ফলটি দেখতে উলটো খোলা ছাতার মতো লাগে। ভিতরে কম্বলের মতো লোমশ অংশ থাকে। লোমগুলো গায়ে লাগলে চুলকানির উদ্রেগ হয়। ফল পাঁচটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত এবং এর ভেতর কালোজিরার মতো ছোট ছোট ৩০০-৪০০টি বীজ সাজানো থাকে।

উলট কম্বল গাছের বীজ, পাতা কাণ্ড এবং মূল প্রতিটি অংশেই রয়েছে ঔষধি গুণাবলী। বিশেষ করে বীজের মধ্যে কিছু বিশেষ প্রাকৃতিক উপাদান পাওয়া যায় যা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। মূলত উলট কম্বল গাছের বীজে থাকা আলকালয়েড এবং গ্লাইকোসাইড যৌগের কারণে এই গাছটি ঔষধি ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।



উলটকম্বল- Abroma augusta

ঔষধি গুণ:

প্রাচীনকাল থেকেই ইউনানি আয়ূর্বেদিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিভিন্ন ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে ওলটকম্বল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই গাছের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর ঔষধি ক্ষমতা। এটি সাধারণত বিভিন্ন ধরনের রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে নারীস্বাস্থ্যে এবং যৌন স্বাস্থ্য উন্নতিতে। নারী প্রজনন স্বাস্থ্যে পুরো গাছই ব্যবহারযোগ্য। এ থেকে তৈরী ওষুধের কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

মানারত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসী বিভাগের একদল নারী গবেষক প্রাচীনকাল থেকেই ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে উলটকম্বলের ব্যাপক ব্যবহার তুলে ধরে এটিকে 'জরায়ু টনিক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইউনানি তো বটেই তবে আয়ূর্বেদিক শাস্ত্রে এর ব্যবহার আরও বেশী।

১। ওলটকম্বলের প্রধান ব্যবহার স্ত্রীরোগে। প্রায় ২০ প্রকারের স্ত্রীরোগে এটি ব্যবহৃত হয় বলে একে "প্রাকৃতিক গাইনি ডাক্তার" বলা হয়। স্ত্রীরোগের মধ্যে প্রধান বাধক দোষ। মহিলাদের অনিয়মিত ঋতুস্রাব, অল্প ঋতুস্রাব, অধিক ঋতুস্রাব, ব্যাথাযুক্ত ঋতুস্রাব, শ্বেতস্রাব, প্রসব-পরবর্তী অধিকস্রাব, জরায়ু প্রদাহ, জরায়ুর দুর্বলতা, যোনি প্রদাহ, সহবাসকালীন ব্যাথা, কোমর ব্যাথা, গর্ভের উৎপত্তি না হওয়া, এগুলোর সাথে অন্যান্য উপসর্গ থাকলে তাদের যে কোনো একটিকে বলে বাধক।

এসব ক্ষেত্রে রোগের নাম ব্যবহার্য অংশ, মাত্রা এবং ব্যবহার পদ্ধতি:
ক) রজঃকৃচ্ছ বা মাসিক স্বল্পতায় মূলের ছাল ৬০ গ্রাম প্রতিবার ২৫০ মি.লি পানিতে জ্বাল দিয়ে পানির পরিমাণ অর্ধেক হলে ছেঁকে সকালে ও বিকেলে সেব্য। পত্রবৃন্ত কুঁচি কুঁচি করে কেটে ১ লিটার পানিতে ১ রাত ভিজিয়ে সকালে খালি পেটে আখের গুড়সহ খেলে উপকার পাওয়া যায়।
খ) ব্যাথাযুক্ত ও অনিয়মিত ঋতুস্রাব, রক্তের রং কালো এবং চাকা চাকা হলে মূলের চাল চূর্ণ ৩ গ্রাম সাথে ১৫০ মি. গ্রাম গোলমরিচের গুঁড়া মিশিয়ে মাসিকের চার-পাঁচ দিন আগে থেকে প্রতিদিন একবার সেব্য। এভাবে ৩/৪ মাস খেলে সমস্যা দূর হয়।
গ) জরায়ু দুর্বলতা ও যোনিপ্রদাহে শুকনো ছাল ১০ গ্রাম, সাথে আশোকছাল-১০ গ্রাম, মুন্ডিফুল -৫ গ্রাম, মেহেদি পাতা-২ গ্রাম, আধা চূর্ণ করে ২৫০ মি.লি. পানিতে জ্বাল দিয়ে পানির পরিমাণ অর্ধেক হলে ছেঁকে সকাল ও বিকেলে সেব্য। এভাবে একমাস খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
ঘ) শ্বেতপ্রদর সাদাস্রাবে মূলের ছাল চূর্ণ ৩ গ্রাম সকাল-সন্ধ্যায় পানিসহ খালি পেটে সেব্য।
ঙ) সহবাসকালীন ব্যাথা ও বুক ধড়ফড় করলে কাঁচা ছাল ১০ গ্রাম বেটে পানিতে গুলে কচলে ছেঁকে এর সাথে অর্জুন ছালের চূর্ণ ৫ গ্রাম অল্প চিনি মিশিয়ে শরবত করে দিনে দুইবার সেব্য।
চ) জরায়ুর স্থানচ্যুতিতে তাজা মূলের ছাল ৫ গ্রাম পিষে পানিতে মিশিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় নিয়ে চিনিসহ সেব্য।
ছ) ব্যাখ্যাতীত কারনে বন্ধ্যাত্ব: মহিলাদের গর্ভধারণের সকল স্বাভাবিক রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও অজানা কারণে যারা বন্ধ্যাত্বে ভুগছেন উলটকম্বলের পঞ্চাঙ্গ (মূল+বাকল+কঁচিডাঁটা+পত্রবৃন্ত+পাতা) ছায়ায় শুকিয়ে ৫ গ্রাম গুঁড়ো ও ১ গ্রাম গোল মরিচ মিশিয়ে পানিতে সিদ্ধ করে তৈরিকৃত জেলির মতো টনিক নিয়মিত সেবন গর্ভধারণের সমুহ সম্ভাবনাকে উন্নত করে ।

২। পুরুষদের শুক্রমেহ শুক্রস্বল্পতা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তাজা পাতার তিন-চারটি ডাঁটা ছেঁচে ২০০ মি.লি. পানিতে কচলিয়ে এককাপ দুধ, সামান্য চিনি মিশিয়ে সকাল-বিকেল খালি পেটে সেব্য।

৩। গাছের মূল ও বীজ যৌন শক্তি বৃদ্ধির প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের যৌন দুর্বলতা যেমন ইরেকটাইল ডিসফাংশন বা অকালপতনের সমস্যা সমাধানে উলটকম্বল গাছের নির্যাস ব্যবহৃত হয়।

৪। পাতা এবং মূলের নির্যাস হজমশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক। এটি শরীরে শক্তি ও উদ্যম যোগায়।

৫। উলটকম্বলের বীজ অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং এতে থাকা বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান মানবদেহের জন্য উপকারী। বীজে থাকা বিশেষ প্রাকৃতিক যৌগ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক যা হৃদরোগ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। হজমশক্তি বাড়ায়, শরীরের মেটাবলিজম প্রক্রিয়াকে সুস্থ রাখে। গবেষণা অনুযায়ী উলটকম্বলের বীজ বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ ও সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখে। বীজের নির্যাস থেকে তৈরি ঔষধ সর্দি-কাশি, জ্বর এবং সংক্রমণজনিত বিভিন্ন সমস্যায় ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে ত্বকের প্রদাহ বা অ্যালার্জি দূরীকরণে বীজের পেস্ট খুবই কার্যকর।

৬। প্রস্রাব জ্বাড়াপোড়া পাতার ডাঁটা তিন-চারটি ডাঁটা ছেঁচে ২৫০ মি.লি. পানিতে কচলিয়ে প্রয়োজনে সামান্য চিনি মিশিয়ে সকাল -বিকাল খালি পেটে সেব্য।

৭। উলটকম্বল গাছ যৌন হরমোনের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং প্রজনন ক্ষমতা উন্নত করে। এর নির্যাস যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধিতেও কার্যকরী বলে প্রাচীন কালের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় উল্লেখ রয়েছে।

৮। গবেষণায় দেখা গেছে উলটকম্বল গাছের মূল, পাতা এবং বীজে থাকা বিভিন্ন প্রাকৃতিক যৌগ ডায়াবেটিস, রক্তচাপ এবং হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এই গাছের নির্যাসে থাকা গ্লাইকোসাইড এবং ফ্ল্যাভোনয়েড যৌগ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে। একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে উলট কম্বল গাছের বীজের নির্যাস ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিশেষ উপকারী কারণ এটি ইনসুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এছাড়াও গাছের মূলের নির্যাস হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে পেটের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সহায়ক।

৯। গাছের বাকল ও ডাঁটা পানিতে ভিজিয়ে রাখলে আঠালো পদার্থ বের হয় যা কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দূর আমাশয় রোগের জন্য উপকারী। পাতা ও কাণ্ডের রস গনোরিয়া, ফোঁড়ার জন্য উপকারী।

১০। ওলটকম্বল পাতা ১০-১৫ মিনিট পানিতে সিদ্ধ করে সেই পানি খালি পেটে সকালে ও রাত্রে ঘুমানোর আগে নিয়মিত পান করলে নারী-শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকগুণে বেড়ে যায়।

১১। ২ টেবিল চামচ ক্যাস্টর অয়েল এর সাথে ২ চা-চামচ ওলটকম্বল গাছের পাতার রস মিশ্রিত করে হালকা গরম করে সপ্তাহে ৩ বার ব্যবহার করলে ২০-৩০ দিনের মধ্যে চুল ঘন কালো এবং উজ্জ্বল হয় ।

১২। দক্ষিণ থাইল্যান্ডের মুসলিম মহিলাগন উলটকম্বল বীজ তেল শরীর ব্যথা নিরাময়ে ব্যবহার করে থাকেন। মহিলাদের কোমর ও জয়েন্টে বাত-ব্যথায় ৩-৪ টি তাজা পত্রবৃন্ত পিষে ২০০ মিলি পানি ও সামান্য চিনিসহ ১ কাপ দুধ সকাল-সন্ধ্যায় খালি পেটে সেব্য ।

১৩। উলটকম্বল মূলের ছাল থেকে এক ধরনের আঠা জাতীয় রস বের হয় যা গবাদিপশুর গবাদিপশুর পাতলা পায়খানা, বিলম্ব প্রজনন এবং হাঁস-মুরগির বিভিন্ন চিকিৎসায় উলটকম্বলের ব্যবহার রয়েছে।

১৪। মহিলাদের বুক ধড়ফড় করলে কাঁচা-ছাল বাটা ১০ গ্রাম পানিতে মিশিয়ে ছেঁকে সাথে অর্জুন-ছাল চুর্ণ ৫ গ্রাম অল্প চিনিসহ শরবত করে দিনে ২ বার সেবন করতে হবে।

১৫। বার্ধক্যজনিত রোগে ২০০ মিলিগ্রাম মূল চূর্ণের সাথে গোল মরিচের গুঁড়া মিশিয়ে পানিসহ দিনে দুইবার সেব্য ।

সতর্কতা:

গর্ভকালীন ওলটকম্বল ব্যবহার নিরাপদ নয়। অধিক সেবনে এলার্জি দেখা দিতে পারে। এছাড়াও মাথাঘোরা, বুক জ্বালাপোড়া, পেটে ব্যাথা ও অতিরিক্ত রক্তস্রাব দেখা দিতে পারে।

অন্যান্য ব্যবহার:

উলটকম্বলের বীজ থেকে তৈরি নির্যাস বা তেল বাজারে প্রচুর বিক্রি হয়। বাকল থেকে দড়ি, কাপড়, মাছ ধরার জাল ও বেতের বিকল্প হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ভারতের কোনো কোনো স্থানে আঁশের জন্য ব্যবসায়িকভাবে চাষ করা হয়। উলটকম্বল মূল ভূমিক্ষয় রোধ করে।

Chemical Composition:

উলটকম্বল গাছে থাকে- Abromine (betaine), friedelin, abromasterol, choline, and beta-sitosterol, choline, betaine, and various fatty acids.

মূলের নির্যাসে থাকে- Sterols: β-sitosterol, stigmasterol, alkaloids and various sugars like rhamnose, arabinose, xylose, mannose, galactose and glucose.

মূলের ছালে- Glucuronic acid, maslinic acid, caffeic acid, Abromin e(alkaloid), Friedelin, Abromasterol, Choline betaine etc. alkaloids, flavonoids, tannins and glycosides. resins, fixed oils, and water-soluble bases.

পাতায় থাকে- Taraxerol, β-sitosterol, lupeol, aliphatic alcohol, octacosanol and a mixture of long-chain fatty diols.

কাণ্ডের ছালে- Alkaloids, Sterol, Gum, Some hydroxyl aicd, based magnesium salts. friedelin, β-sitosterol পাওয়া যায়।

আল্লাহতালা মানব জাতির কল্যাণে দুনিয়ায় অগণিত জিনিস সৃষ্টি করেছেন, এরমধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত উদ্ভিদ। জীবন ধারণে রয়েছে এর প্রত্যক্ষ অবদান। শারীরিক সুস্থতায় এর ভূমিকাও ব্যাপক। আমরা সবাই জানি সেই প্রাচীন প্রবাদ 'চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধই শ্রেয়'। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদি যুগে রোগ নিরাময়ের প্রধান উপায় বা সম্বল ছিল গাছ গাছড়ার ভেষজগুণ। প্রকৃতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে সকল রোগ নিরাময়ের উপাদান। কোনো রোগের জন্য সঠিক উদ্ভিদ চিনে এর উপযুক্ত মাত্রার ব্যবহার দিতে পারে সুন্দর আনন্দময় এবং ঝামেলা মুক্ত জীবন।

তথ্যসূত্র:

https://gachokath.com/
https://bn.wikipedia.org/wiki/
https://campustimes.press/article/feature/13248
https://sblglobal.com/product/abroma-augusta-mt-1270
https://www.inaturalist.org/taxa/67574-Calotropis-gigantea
https://en.wikipedia.org/wiki/Lagerstroemia_speciosa
https://en.wikipedia.org/wiki/Cassia_fistula

সহায়ক গ্রন্থ:

🖃 এনায়েত হোসেন, গাজী আজমল, সফিউর রহমান, তরিকুল ইসলাম রচিত উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান
প্রথম পত্র। গাজী পাবলিশার্স, ৩৭ বাংলা বাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল- আগস্ট, ১৯৯৮ ইং।
🖃 অবনীভ'ষণ ঠাকুর, ভেষজ উদ্ভিদ ও লোকজ ব্যবহার, প্রথম খণ্ড। অবসর প্রকাশ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা। প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ ইং।
🖃 ডা: মোহাম্মদ বাবুল আক্তার, দেশজ ভেষজ ও তার লোকজ প্রয়োগ। সিসিডিবি প্রকাশন, প্রকাশকাল- জুন, ২০০১।

লেখক:
হোসনে আরা পারভীন
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
জীববিজ্ঞান, ধরমপুর মহাবিদ্যালয়
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

মানুষের মহাজাগতিক ঠিকানা

মোঃ হাদিসুর রহমান

ভূমিকা: আকাশের দিকে তাকালে যে প্রশ্নটি জাগে

মানুষ যখন প্রথমবার রাতের আকাশের দিকে তাকিয়েছিল, তখন থেকেই একটি প্রশ্ন তাকে তাড়িত করে এসেছে– আমরা কোথায় আছি? আমাদের ঠিকানা কি শুধু একটি গ্রাম, একটি শহর, একটি দেশ? নাকি এর চেয়েও অনেক বৃহৎ কোনো বাস্তবতার অংশ আমরা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষ ধীরে ধীরে আবিষ্কার করেছে এক বিস্ময়কর সত্য! আমাদের অস্তিত্ব শুধু পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ নয়; আমরা একটি বিশাল মহাজাগতিক কাঠামোর অংশ। সেই কাঠামো এতটাই বিস্তৃত যে মানুষের কল্পনাও অনেক সময় তার কাছে হার মেনে যায়।

এই প্রবন্ধে আমরা মানুষের সেই "মহাজাগতিক ঠিকানা" অনুসন্ধান করবো। ধাপে ধাপে, পৃথিবী থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত। আমরা দেখবো, আমাদের অবস্থান কোথায়, কীভাবে আমরা সেখানে পৌঁছেছি এবং এই জ্ঞানের অর্থ কী।

পৃথিবী: পরিচিতির সূচনা

আমাদের যাত্রা শুরু হয় পৃথিবী থেকে–আমাদের বাসস্থান, আমাদের জন্মভূমি। পৃথিবী এমন একটি গ্রহ যেখানে পানি তরল অবস্থায় বিদ্যমান, বায়ুমণ্ডল আমাদের রক্ষা করে এবং সূর্যের আলো জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। কিন্তু পৃথিবীকে আমরা যতই বড় মনে করি না কেন, মহাজাগতিক পরিমাপে এটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখলে এটি একটি নীলাভ গোলকের মতো–অসীম অন্ধকারের মাঝে ভাসমান এক ক্ষুদ্র বিন্দু হিসেবে আবিষ্কার করবো।

এই ক্ষুদ্র গ্রহেই গড়ে উঠেছে জটিল প্রাণ, চেতনা এবং এমন এক বুদ্ধিমত্তা যা নিজেই নিজের অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে। এই দিক থেকে পৃথিবী শুধু একটি গ্রহ নয়; এটি একটি অনন্য ল্যাবরেটরি যেখানে মহাবিশ্ব নিজেকে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছে।

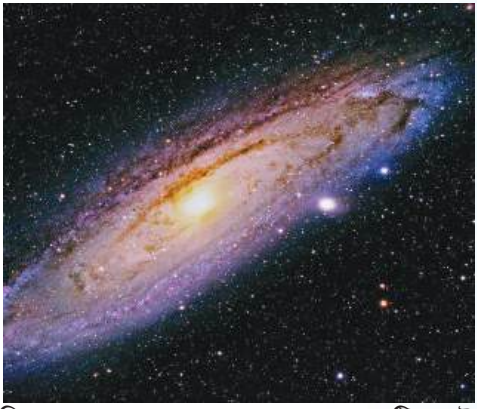
সৌরজগৎ: সূর্যের চারপাশে আমাদের অবস্থান

পৃথিবী একা নয়। এটি সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত একটি বৃহৎ ব্যবস্থার অংশ–যাকে আমরা সৌরজগৎ বলি। সূর্য একটি নক্ষত্র এবং এটি আমাদের জীবনের প্রধান শক্তির উৎস। পৃথিবীসহ আরও সাতটি গ্রহ সূর্যের চারপাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে। এই গ্রহগুলোর মধ্যে কিছু শিলা দিয়ে তৈরি, আবার কিছু গ্যাসীয় দৈত্য। সৌরজগতের বিস্তৃতি এতটাই বড় যে এর দূরত্ব বোঝার জন্য "আলোকবর্ষ" বা "আলো-সময়ের" ধারণা ব্যবহার করতে হয়। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছাতে সময় লাগে প্রায় আট মিনিট, যা আমাদের নিকটবর্তী দূরত্বের একটি ছোট উদাহরণ মাত্র। এই ব্যবস্থার ভেতরে পৃথিবীর অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি এমন এক দূরত্বে অবস্থিত যেখানে পানি তরল থাকতে পারে–যাকে বলা হয় "বাসযোগ্য অঞ্চল"। এই অবস্থানই পৃথিবীতে জীবনের বিকাশকে সম্ভব করেছে।

আকাশগঙ্গা: আমাদের গ্যালাক্সির বিস্ময়

আমাদের চিরচেনা এই পৃথিবী, যার বিশালতা নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই, সেটি আসলে মহাবিশ্বের এক ধূলিকণার চেয়েও ক্ষুদ্র অংশ। এই ক্ষুদ্র পৃথিবী যে সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, সেই সূর্য নিজেই একটি অতি বৃহৎ কাঠামোর অতি ক্ষুদ্র সদস্য। এই কাঠামোর নাম আকাশগঙ্গা বা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি। এটি কেবল কতগুলো নক্ষত্রের সমাহার নয় বরং এটি মহাকাশের এক রহস্যময় ও জাঁকজমকপূর্ণ মহানগরী। এই গ্যালাক্সির ধারাবাহিক আলোচনায় আমরা এর বিশালতা এবং আমাদের মহাজাগতিক অবস্থান বোঝার চেষ্টা করবো।

১. সর্পিল বাহু ও আমাদের ঠিকানা



আকাশগঙ্গা একটি ব্যারড স্পাইরাল (Barred Spiral) বা দণ্ডযুক্ত সর্পিল গ্যালাক্সি। যদি ওপর থেকে দেখা যেত, তবে এটিকে একটি ঘূর্ণায়মান চাকার মতো মনে হতো, যার কেন্দ্র থেকে অনেকগুলো বাঁকানো বাহু বের হয়ে এসেছে। আমাদের সৌরজগৎ এই গ্যালাক্সির একেবারে কেন্দ্রে নয় বরং কেন্দ্র থেকে প্রায় ২ ৭,০০০ আলোকবর্ষ দূরে অরিয়ন বাহু (Orion Arm) নামক একটি ছোট বাহুর ভেতর অবস্থিত। এই অবস্থানটি আমাদের অস্তিত্বের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। গ্যালাক্সির কেন্দ্রভাগ অত্যন্ত ঘন এবং সেখানে একটি অতিবিশাল ব্ল্যাকহোল রয়েছে। কেন্দ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে নক্ষত্রদের ঘনত্ব এত বেশি যে সেখানে বিকিরণের মাত্রা প্রাণ ধারণের জন্য অসহনীয়। আমরা অনেকটা শহরের কোলাহলমুক্ত শান্ত এক উপশহরে বাস করছি, যেখানে পরিবেশ স্থিতিশীল।

২. বিশালতার সংজ্ঞা ও আলোর গতি

আকাশগঙ্গার বিশালতা কল্পনা করা আমাদের সাধারণ মস্তিষ্কের জন্য প্রায় অসম্ভব। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতে, এই গ্যালাক্সির ব্যাস প্রায় ১,০০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ আলোকবর্ষ। আলোকবর্ষ হলো সেই দূরত্ব, যা আলো এক বছরে অতিক্রম করে।

- **আলোর গতি:** প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩,০০,০০০ কিলোমিটার।
- **ভ্রমণ সময়:** আপনি যদি আলোর গতিতে ভ্রমণ শুরু করেন, তবে আকাশগঙ্গার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছাতে আপনার সময় লাগবে এক লক্ষ বছরেরও বেশি।

- **তুলনা:** মানুষের গড় আয়ু যদি ৮০ বছর হয়, তবে এই পথ পাড়ি দিতে ১২৫০টি প্রজন্ম পার হয়ে যাবে, তবুও যাত্রা শেষ হবে না।

৩. নক্ষত্রের মেলা:

শত বিলিয়নের রাজ্য আকাশগঙ্গায় নক্ষত্রের সংখ্যা কত? বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, এখানে ২০০ থেকে ৪০০ বিলিয়ন (২০,০০০ থেকে ৪০,০০০ কোটি) নক্ষত্র রয়েছে। আমাদের সূর্য এদের মধ্যে একটি অত্যন্ত সাধারণ নক্ষত্র। সূর্যের চেয়েও হাজার গুণ বড় এবং উজ্জ্বল নক্ষত্র যেমন আছে, তেমনি সূর্যের চেয়ে অনেক ছোট 'লাল বামন' (Red Dwarf) নক্ষত্রও রয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই প্রতিটি নক্ষত্রের নিজস্ব জগৎ থাকতে পারে। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, আকাশগঙ্গার অধিকাংশ নক্ষত্রকেই ঘিরে অন্তত একটি করে গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ, আমাদের গ্যালাক্সিতে শুধু নক্ষত্রই নয়, কয়েকশ বিলিয়ন গ্রহও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

৪. নক্ষত্রমণ্ডলীর গভীর রহস্য

আকাশগঙ্গার ভেতরে নক্ষত্রগুলো স্থির নয়। একটি বিশাল লাটিমের মতো পুরো গ্যালাক্সিটি তার কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে। আমাদের সূর্যও তার পুরো পরিবার নিয়ে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২৩০ কিলোমিটার বেগে গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে। একবার পূর্ণ চক্কর দিতে সূর্যের সময় লাগে প্রায় ২২.৫ থেকে ২৫ কোটি বছর। একে বলা হয় এক কসমিক ইয়ার (Cosmic Year) বা মহাজাগতিক বছর। শেষবার যখন সূর্য আকাশগঙ্গার বর্তমান অবস্থানে ছিল, তখন পৃথিবীতে ডাইনোসরদের রাজত্ব শুরু হচ্ছিল।

৫. গ্যাস, ধূলিকণা এবং অন্ধকার বস্তু

গ্যালাক্সি মানেই শুধু নক্ষত্র নয়। নক্ষত্রদের মাঝখানের বিশাল শূন্যস্থানে রয়েছে বিপুল পরিমাণ গ্যাস (প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম) এবং মহাজাগতিক ধূলিকণা। একে বলা হয় ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম (Interstellar Medium)। এই গ্যাস ও ধূলিকণাই হলো নতুন নক্ষত্র জন্মের আঁতুড়ঘর। একেকটি বিশাল নেবুলা বা নীহারিকা থেকে জন্ম নেয় হাজার হাজার নতুন সূর্য। তবে আকাশগঙ্গার সবচেয়ে বড় রহস্য হলো ডার্ক ম্যাটার (Dark Matter) বা অন্ধকার বস্তু। আমরা যা কিছু দেখি–নক্ষত্র, গ্রহ, ধূলিকণা–তা গ্যালাক্সির মোট ভরের মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশ। বাকি প্রায় ৮৫-৯০ শতাংশই হলো এই অদৃশ্য অন্ধকার বস্তু,যা আমরা দেখতে পাই না কিন্তু এর মহাকর্ষীয় টান পুরো গ্যালাক্সিকে একত্রে ধরে রেখেছে।

৬. গ্যালাক্সির বাইরে: মহাজাগতিক প্রতিবেশ

আকাশগঙ্গা মহাকাশে একা নয়। এটি প্রায় ৫০টিরও বেশি ছোট-বড় গ্যালাক্সির একটি দলের সদস্য, যাকে বলা হয় লোকাল গ্রুপ (Local Group)। আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিবেশী হলো অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি।

অ্যান্ড্রোমিডা এতটাই কাছাকাছি যে খালি চোখে এটি দেখা যায়, যদিও এটি আমাদের থেকে প্রায় ২৫ লাখ আলোকবর্ষ দূরে। আরও বিস্ময়কর বিষয় হলো–এই দুই গ্যালাক্সি ধীরে ধীরে একে অপরের দিকে এগিয়ে আসছে এবং কয়েক বিলিয়ন বছর পরে তারা

একত্রিত হতে পারে। লোকাল গ্রুপ আবার একটি আরও বৃহৎ কাঠামোর অংশ, যা সুপারক্লাস্টার নামে পরিচিত। এই স্তরে এসে আমরা দেখি, মহাবিশ্ব কোনো এলোমেলো বিশৃঙ্খলা নয় বরং এটি একটি জটিল জালের মতো সংগঠিত। আজ থেকে প্রায় ৪৫০ কোটি বছর পর এই দুটি বিশাল গ্যালাক্সির মধ্যে এক মহাজাগতিক সংঘর্ষ ঘটবে এবং তারা মিলেমিশে একটি বিশাল উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সিতে পরিণত হবে। যদিও একে 'সংঘর্ষ' বলা হচ্ছে, কিন্তু নক্ষত্রদের মাঝখানের দূরত্ব এত বেশি যে দুটি নক্ষত্রের মধ্যে সরাসরি ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য।

৭. একটি গভীর উপলব্ধি: আমরা কোথায়?

আকাশগঙ্গার এই বিশাল প্রেক্ষাপটে দাঁড়ালে মানুষের অহংকার ফিকে হয়ে আসে। আমাদের সূর্য একটি সাধারণ নক্ষত্র, যা একটি সাধারণ গ্যালাক্সির এক সাধারণ কোণায় অবস্থিত। মহাবিশ্বে আকাশগঙ্গার মতো আরও বিলিয়ন বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে।

এই উপলব্ধি আমাদের দুটি সত্যের মুখোমুখি করে:

- ক্ষুদ্রতা: আমরা এই মহাজাগতিক সমুদ্রে একটি বালুকণার চেয়েও নগণ্য।
- বিশেষত্ব: এই বিশাল ও জনমানবহীন মহাকাশে আমাদের এই ছোট্ট নীল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব এবং সেই প্রাণ কর্তৃক মহাবিশ্বকে বোঝার ক্ষমতা এক পরম বিস্ময়।

আকাশগঙ্গা কেবল একটি বৈজ্ঞানিক কাঠামো নয়, এটি আমাদের অস্তিত্বের শেকড়। রাতের পরিষ্কার আকাশে যখন আমরা রূপালী ধোঁয়ার মতো ছায়াপথটি দেখি, তখন আসলে আমরা আমাদের নিজেদের 'বাড়ির' বিশালতাকেই প্রত্যক্ষ করি। আমাদের চারপাশের এই অগণিত নক্ষত্র আর গ্রহের ভিড়ে হয়তো অন্য কোনো সভ্যতার কেউ ঠিক এই মুহূর্তেই আমাদের সূর্যের দিকে তাকিয়ে একইভাবে ভাবছে–"ওখানেও কি কেউ আছে?!"


মহাকাশ থেকে তোলা পৃথিবীর একটি ছবি

মহাবিশ্ব: অসীমের পথে এক মহাজাগতিক যাত্রা

আমরা যখন আমাদের পৃথিবী, সৌরজগৎ এবং আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সিকে ছাড়িয়ে আরও গভীরে দৃষ্টিপাত করি, তখন আমরা মুখোমুখি হই অস্তিত্বের চূড়ান্ত সীমানার–যাকে আমরা বলি মহাবিশ্ব। এটি কেবল গ্রহ-নক্ষত্রের সমষ্টি নয় বরং এটি স্থান, সময় এবং সমস্ত পদার্থ ও শক্তির এক পরম আধার। এই বিশালতার কোনো শুরু বা শেষ আমাদের সাধারণ যুক্তিতে ধরা পড়ে না, তবুও বিজ্ঞান তার নিরন্তর প্রচেষ্টায় এই রহস্যের জট খোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

১. মহাবিশ্বের জন্ম ও সময়ের পরিমাপ

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব অনুযায়ী, আজ থেকে প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন (১৩৮০ কোটি) বছর আগে একটি অতি ক্ষুদ্র এবং অসীম ঘনত্বের বিন্দু থেকে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সূচনা হয়, যা বিগ ব্যাং (Big Bang) নামে পরিচিত।

🗗 মহাজাগতিক ক্যালেন্ডার: যদি মহাবিশ্বের পুরো ১৩.৮ বিলিয়ন বছরকে একটি সাধারণ এক বছরের ক্যালেন্ডারে বসানো হয়, তবে দেখা যাবে যে আধুনিক মানুষের জন্ম হয়েছে ৩১শে ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে। অর্থাৎ, মহাজাগতিক সময়ের তুলনায় আমাদের অস্তিত্ব মাত্র কয়েক সেকেন্ডের।

প্রথম আলো: বিগ ব্যাং-এর প্রায় ৩,৮০,০০০ বছর পর মহাবিশ্ব যথেষ্ট শীতল হয় এবং আলো প্রথম মুক্তভাবে চলাচল করতে শুরু করে। এই প্রাচীন আলোকে বলা হয় কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড (CMB), যা আজও মহাকাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

২. প্রসারণশীল মহাবিশ্ব ও হাবল ধ্রুবক

মহাবিশ্ব স্থির নয়; এটি বেলুনের মতো ক্রমাগত ফুলে ফেঁপে উঠছে। ১৯২৯ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল প্রমাণ করেন যে, গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

🗗 **প্রসারণের গতি:** এই প্রসারণের হারকে বলা হয় হাবল ধ্রুবক (Hubble Constant)। মজার ব্যাপার হলো, মহাবিশ্ব কেবল প্রসারিতই হচ্ছে না বরং সময়ের সাথে সাথে এই প্রসারণের গতি ত্বরান্বিত হচ্ছে।

🗗 **মহাজাগতিক দিগন্ত:** মহাবিশ্বের প্রসারণের গতি এত বেশি যে, অনেক দূরবর্তী গ্যালাক্সির আলো কখনোই আমাদের কাছে পৌঁছাবে না। এর ফলে তৈরি হয় একটি দৃশ্যমান সীমানা, যার নাম কসমিক হরাইজন।

৩. দৃশ্যমান মহাবিশ্ব বনাম অদৃশ্য মহাবিশ্ব

আমরা টেলিস্কোপ দিয়ে যা কিছু দেখি, তা হলো দৃশ্যমান মহাবিশ্ব (Observable Universe)। এর ব্যাস প্রায় ৯৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ। আপনি হয়তো ভাবছেন, মহাবিশ্বের বয়স যদি ১৩.৮ বিলিয়ন বছর হয়, তবে ব্যাস ৯৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ হয় কী করে? এর কারণ হলো মহাকাশের প্রসারণ। আলো যখন আমাদের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল, তখন মহাকাশ প্রসারিত হয়ে সেই দূরত্বকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে এই বিশাল দৃশ্যমান অংশটি পুরো মহাবিশ্বের একটি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। এর বাইরে মহাবিশ্ব কতটা বড়, তা আমাদের অজানা। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন মহাবিশ্ব অসীম, আবার কেউ কেউ মনে করেন এটি একটি বহু-মহাবিশ্ব বা মাল্টিভার্স (Multiverse) এর অংশ।

৪. অন্ধকারের রহস্য: ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি

আমরা যা কিছু দেখি–মানুষ, পাহাড়, গ্রহ, নক্ষত্র–সবই তৈরি হয়েছে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন দিয়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই সাধারণ পদার্থ (Normal Matter) পুরো মহাবিশ্বের মাত্র ৫ শতাংশ। বাকি ৯৫ শতাংশই আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

উপাদান	পরিমাণ	কাজ
সাধারণ পদার্থ	৫%	গ্রহ, নক্ষত্র এবং আমাদের দেহ গঠন করে।
ডার্ক ম্যাটার	২৭%	এটি অদৃশ্য আঠার মতো কাজ করে এবং মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে গ্যালাক্সিগুলোকে একত্রে ধরে রাখে।
ডার্ক এনার্জি	৬৮%	এটি মহাকাশের প্রতিটি বিন্দুতে বিদ্যমান এক রহস্যময় শক্তি যা মহাবিশ্বকে বাইরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং প্রসারণের গতি বাড়াচ্ছে।

৫. মহাবিশ্বের বৃহদাকার কাঠামো (Large Scale Structure)

মহাবিশ্বকে ওপর থেকে দেখলে একে একটি বিশাল জালের মতো মনে হয়, যাকে বলা হয় কসমিক ওয়েব (Cosmic Web)। নক্ষত্রগুলো মিলে তৈরি হয় গ্যালাক্সি, গ্যালাক্সিগুলো মিলে তৈরি হয় গ্যালাক্সি ক্লাস্টার, আর অনেকগুলো ক্লাস্টার মিলে তৈরি হয় সুপার-ক্লাস্টার। এই সুপার-ক্লাস্টারগুলো মহাজাগতিক সুতোর মতো একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে, আর মাঝখানে থাকে বিশাল শূন্যস্থান বা ভয়েড (Void)। আমাদের আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সি 'লানিয়াকেয়া' (Laniakea) নামক এক বিশাল সুপার-ক্লাস্টারের অংশ।

৬. মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ ও চূড়ান্ত পরিণতি

মহাবিশ্ব কি চিরকাল এভাবেই চলতে থাকবে? বিজ্ঞানীরা এর তিনটি সম্ভাব্য পরিণতির কথা বলেন:

- **বিগ ফ্রিজ (Big Freeze):** মহাবিশ্ব প্রসারিত হতে হতে এত বড় ও শীতল হয়ে যাবে যে, সব নক্ষত্র নিভে যাবে এবং পুরো মহাবিশ্ব এক পরম শূন্যতায় নিমজ্জিত হবে।

- **বিগ রিপ (Big Rip):** ডার্ক এনার্জি এত শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে তা পরমাণুর ভেতরের বন্ধনকেও ছিঁড়ে ফেলবে।
- **বিগ ক্রাঞ্চ (Big Crunch):** প্রসারণ থেমে গিয়ে মহাকর্ষের টানে মহাবিশ্ব আবার সংকুচিত হয়ে একটি বিন্দুতে ফিরে আসবে।

৭. আমাদের অস্তিত্বের সার্থকতা

মহাবিশ্বের এই আদিগন্ত পরিসরের তুলনায় আমরা এতটাই ক্ষুদ্র যে আমাদের বর্ণনা করার মতো কোনো গাণিতিক একক নেই। তবে এই বিশালতার মাঝেও একটি গভীর সত্য লুকিয়ে আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ তাঁদের গবেষণালব্ধ অনুসন্ধান থেকে আমাদেরকে যা জানাচ্ছে সেটি হলো- আমাদের শরীরের প্রতিটি কার্বন, অক্সিজেন এবং আয়রন পরমাণু কোটি কোটি বছর আগে কোনো এক বিশাল নক্ষত্রের হৃদয়ে তৈরি হয়েছিল, যা নক্ষত্রের মৃত্যুর পর মহাকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সাগান বলেছিলেন–"আমরা আসলে নক্ষত্রের উপাদান দিয়ে তৈরি (We're made of star stuff)"। মহাবিশ্ব কেবল আমাদের বাইরে নয়, আমরাও মহাবিশ্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যখন আমরা মহাবিশ্বকে বুঝতে চাই, আসলে মহাবিশ্বই আমাদের মাধ্যমে নিজেকে জানার চেষ্টা করে। এই উপলব্ধিই আমাদের জাগতিক পরিচয়কে ছাড়িয়ে এক মহাজাগতিক চেতনায় উন্নীত করে।

আমাদের মহাজাগতিক ঠিকানা শুধু স্থান দিয়ে নির্ধারিত নয়; এটি সময়ের সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। আমরা এমন একটি সময়ে বাস করছি যখন মহাবিশ্ব এখনও সক্রিয়, নক্ষত্র গঠন হচ্ছে এবং জীবন সম্ভব। ভবিষ্যতে মহাবিশ্ব আরও শীতল ও অন্ধকার হয়ে যেতে পারে, যেখানে জীবন টিকে থাকা কঠিন হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা একটি বিশেষ যুগের বাসিন্দা–একটি "কসমিক মুহূর্তে" অবস্থান করছি, যেখানে মহাবিশ্বকে বোঝার সুযোগ আমাদের সামনে উন্মুক্ত।

মানুষের বিশেষত্ব এখানেই যে, আমরা শুধু মহাবিশ্বের অংশ নই; আমরা এটি সম্পর্কে সচেতন। আমরা পর্যবেক্ষণ করি, বিশ্লেষণ করি এবং বোঝার চেষ্টা করি। এই চেতনা

আমাদের মহাবিশ্বের সঙ্গে একটি অনন্য সম্পর্ক তৈরি করেছে। আমরা টেলিস্কোপ বানিয়েছি, মহাকাশযান পাঠিয়েছি এবং দূরবর্তী গ্যালাক্সির আলো বিশ্লেষণ করছি। এক অর্থে, মহাবিশ্ব নিজেই মানুষের মাধ্যমে নিজেকে জানার চেষ্টা করছে। মানুষের মহাজাগতিক যাত্রা এখনও শেষ হয়নি। আমরা ইতিমধ্যে চাঁদে গিয়েছি, মঙ্গল গ্রহে রোবট পাঠিয়েছি এবং অন্যান্য নক্ষত্রের গ্রহ আবিষ্কার করছি। ভবিষ্যতে হয়তো মানুষ অন্য গ্রহে বসবাস করবে, এমনকি অন্য নক্ষত্রে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। তখন আমাদের ঠিকানা আরও বিস্তৃত হবে–পৃথিবী থেকে বহুগ্রহে এবং হয়তো একদিন বহু নক্ষত্রে।

উপসংহার: আমাদের প্রকৃত ঠিকানা

যদি আমরা আমাদের সম্পূর্ণ মহাজাগতিক ঠিকানাটি লিখতে চাই, তবে তা হবে এক দীর্ঘ, বিস্ময়কর শৃঙ্খল–

মানুষ > পৃথিবী > সৌরজগৎ > আকাশগঙ্গা > গ্যালাক্সি গোষ্ঠী > সুপারক্লাস্টার > মহাবিশ্ব।

এই ঠিকানা আমাদের ক্ষুদ্রতাকে যেমন তুলে ধরে, তেমনি আমাদের গুরুত্বকেও নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে। আমরা ক্ষুদ্র, কিন্তু আমরা সচেতন। আমরা সীমিত, কিন্তু আমরা কৌতূহলী। আমরা একটি ছোট গ্রহে বাস করি, কিন্তু আমাদের চিন্তা সমগ্র মহাবিশ্বকে ছুঁতে পারে। রাতের আকাশে যখন আপনি তাকাবেন, তখন মনে রাখবেন–আপনি শুধু একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই; আপনি দাঁড়িয়ে আছেন মহাবিশ্বের গভীরে এবং সেই মহাবিশ্বের একটি অংশ আপনার ভেতরেও বিদ্যমান। এটাই মানুষের মহাজাগতিক ঠিকানা–একটি অবস্থান, একটি ইতিহাস এবং এক অসীম সম্ভাবনার গল্প।

তথ্যসূত্র (References)

1.NASA. (2023, December 15). The Milky Way Galaxy. NASA Solar Szstem Exploration.
https://solarsystem.nasa.gov/galaxies/milky-way/overview/

2.Hawking, S. W. (1998). A brief history of time (Updated and expanded 10th anniversary ed.). Bantam Books.

3.Bennett, J. O., Donahue, M., Schneider, N., & Voit, M. (2019). The cosmic perspective (9th ed.). Pearson.

4.Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results: VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics, 641, A6. https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833914

5.Tyson, N. D. (2021). Astrophysics for people in a hurry. W. W. Norton & Company.

লেখক:

মোঃ হাদিসুর রহমান

লাইব্রেরিয়ান কাম-ডকুমেন্টেশন অফিসার

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর।

জলবিদ্যুৎ: নবায়নযোগ্য শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস

এম.এম. রুবায়েত হোসেন

জলবিদ্যুৎ কি?

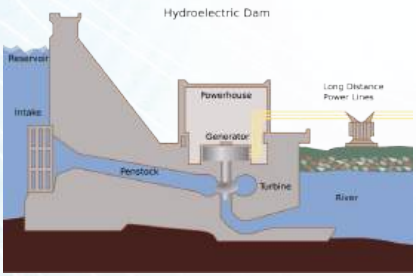
পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় ৭১% পানি দ্বারা আচ্ছন্ন। প্রচুর পানি অবিরত বয়ে চলছে পৃথিবীর বুক চিড়ে। তৈরি করেছে সাগর মহাসাগর, নদী, ঝর্ণাসহ আরও নানা কিছু। পৃথিবীর ঘূর্ণন, বায়ুমণ্ডলীয় তাপ-চাপের হ্রাস-বৃদ্ধি, ভূ-সংস্থান ইত্যাদি নানা কারণে ঢেউ তৈরি হচ্ছে প্রবাহমান পানিতে। সমুদ্র বা স্রোতস্বিনী নদীতে কখনো নামলে ঢেউয়ের শক্তি নিশ্চয়ই টের পেয়েছেন। পানির ঢেউয়ের এই শক্তিকে মানুষের কাজে লাগানোর ইতিহাস অনেক পুরনো। শত শত বছর ধরে মানুষ পানির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে শস্য মাড়াই, আটা তৈরির মতো পরিশ্রমের কাজগুলো করেছে। আধুনিক যুগে মানুষ আরও একধাপ এগিয়ে তৈরি করেছে জলবিদ্যুৎ। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জরিপকারী প্রতিষ্ঠান স্ট্যাটিস্টার তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে পৃথিবীর মোট বিদ্যুৎ চাহিদার প্রায় ১৬ শতাংশের জোগান এসেছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো থেকে। সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এমন ১০টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম পাঁচটিই জলবিদ্যুৎকেন্দ্র। নদী ও জলপ্রপাতের পানির বেগ ব্যবহার করে টারবাইন যন্ত্রের সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, তাকে জলবিদ্যুৎ বলে। পড়ন্ত বা স্রোত আছে এমন নদীর পানির চাপকে ব্যবহার করে তৈরি করা হয় জলবিদ্যুৎ। এটি নবায়নযোগ্য শক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম। একবার যদি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা সম্ভব হয়, খুব কম শক্তি ব্যয়ের মাধ্যমে এটি চালানো যায়। এটা জীবাশ্ম জ্বালানী, যেমন: তেল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তুলনায় খুব কম পরিমাণে গ্রীনহাউস গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন করে। জলবিদ্যুৎ পৃথিবীর মোট বিদ্যুতের প্রায় ১৬% এবং নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের প্রায় ৪৫-৫০% উৎপন্ন করে। ২০২৪ সালে জলবিদ্যুৎ বিশ্বের প্রায় ৪,৫০০ TWh বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে, যা অন্যান্য সমস্ত নবায়নযোগ্য শক্তি উৎসের চেয়ে বেশি এমনকি পারমাণবিক শক্তির চেয়েও বেশি। সবচেয়ে কম খরচে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। বাংলাদেশের রাঙামাটির কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

জলবিদ্যুতের ইতিহাস ও বৈশ্বিক বিকাশ: এক পর্যালোচনা

জলবিদ্যুতের ইতিহাস প্রায় দেড় শতাব্দী পুরনো। ১৮৭৮ সালে ইংল্যান্ডের নর্থম্বারল্যান্ডের ক্র্যাগসাইডে উইলিয়াম আর্মস্ট্রং বিশ্বের প্রথম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করেন। এটি তার ব্যক্তিগত আর্ট গ্যালারিতে একটি আর্ক ল্যাম্প চালু রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী সময়ে, ১৮৮১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের নিকটবর্তী স্কোয়েলকপ্ফ পাওয়ার স্টেশন থেকে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। এরপর, ১৮৮২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর, এডিসনের প্রতিষ্ঠিত ভলকান স্ট্রিট প্ল্যান্ট প্রায় ১২.৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে–যা ছিল এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

১৮৮৬ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ৪৫টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয় এবং ১৮৮৯ সালের মধ্যে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ২০০-তে। ওয়ারউইক ক্যাসলের জলচালিত জেনারেটর হাউস ১৮৯৪ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত দুর্গের বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হতো। ২০ শতকের শুরুতে শহরাঞ্চলের নিকটে পাহাড়ি এলাকায় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে শুরু করে, যা ধীরে ধীরে বৃহৎ আকার ধারণ করে। এই সময় থেকেই জলবিদ্যুৎকে "সাদা কয়লা" (White Coal) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, কারণ এটি ছিল জীবাশ্ম জ্বালানির তুলনায় পরিচ্ছন্ন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস।

১৯৩৬ সালে হুভার ড্যাম ছিল বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, যার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১,৩৪৫ মেগাওয়াট। কিন্তু ১৯৪২ সালে এই রেকর্ড ভেঙে দেয় গ্র্যান্ড কুলি ড্যাম, যার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৬,৮০৯ মেগাওয়াট। দক্ষিণ আমেরিকায় ১৯৮৪ সালে নির্মিত ইটাইপু ড্যাম ১৪ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে অঞ্চলটির বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। পরবর্তীতে, ২০০৮ সালে চীনের থ্রি গর্জেস ড্যাম ২২.৫ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বৈশ্বিক রেকর্ড স্থাপন করে। বর্তমানে কিছু দেশ যেমন নরওয়ে ও প্যারাগুয়ে তাদের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার প্রায় ৮৫% জলবিদ্যুৎ থেকে পূরণ করে থাকে এবং ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো ও ব্রাজিলের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার বড় একটি অংশ জলবিদ্যুৎ থেকে পূরণ করে থাকে। ২০২১ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী জলবিদ্যুৎ স্থাপনা হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা পৌঁছায় প্রায় ১,৪০০ গিগাওয়াটে, যা সব নবায়নযোগ্য শক্তির মধ্যে সর্বোচ্চ। চীন, ব্রাজিল এবং নরওয়ের মতো দেশে জলবিদ্যুৎ একটি অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে। ২০২২ সালে চীন একাই প্রায় ২৪ গিগাওয়াট নতুন জলবিদ্যুৎ সংযুক্ত করেছে, যা বৈশ্বিক নতুন সংযোগের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। ইউরোপ ১৯৯০ সালের পর সর্বোচ্চ ২ গিগাওয়াট জলবিদ্যুৎ যোগ করেছে, যা এই অঞ্চলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। বিশ্বব্যাপী ২০২২ সালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ৭০ টেরাওয়াট-ঘণ্টা (TWh) বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২% প্রবৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে এবং অন্যান্য সব শক্তি প্রযুক্তিকে ছাপিয়ে এক অনন্য রেকর্ড হিসেবে বিবেচিত।





ছবি: Cross-section of a conventional hydroelectric dam

জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও উপলব্ধ শক্তি গণনা

জলবিদ্যুৎ তৈরি করা হয় মূলত পড়ন্ত বা স্রোতযুক্ত নদীর পানির চাপকে কাজে লাগিয়ে। প্রবাহিত পানির শক্তির উৎস হলো অভিকর্ষ বা পৃথিবীর মহাকর্ষ বল। সূর্যের তাপে কিংবা উদ্ভিদের প্রস্বেদনের ফলে পানি বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যায়। এই জলীয়বাষ্প উপর দিকে উঠে গিয়ে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে পানির কণায় পরিণত হয় এবং বৃষ্টির মাধ্যমে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। যদি তাপমাত্রা খুব কম হয়, তবে এই জলীয়বাষ্প বরফ হয়ে তুষারপাতে পরিণত হয়। সাধারণত উঁচু জায়গায় বৃষ্টি বা তুষারপাত বেশি হয়, ফলে পাহাড়ি ঢালে এসব পানি গড়িয়ে নদী গঠন করে এবং শেষ পর্যন্ত তা গিয়ে পড়ে সমুদ্রে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পানিচক্র।

মহাকর্ষ বলের কারণেই বৃষ্টির পানি উঁচু অঞ্চল থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। আমরা প্রায়ই বলি, "পানি উঁচু স্থান থেকে নিচু স্থানে প্রবাহিত হয়।" আসলে এর পেছনে কাজ করে মহাকর্ষ বল। মহাশূন্যে, যেখানে মহাকর্ষজ টান নেই, সেখানে পানি কোনো পাত্র ছাড়াই ভেসে থাকে। অর্থাৎ, মহাকর্ষজ ত্বরণ না থাকলে 'উঁচু' ও 'নিচু' ধারণার অর্থই থাকে না। উঁচু অঞ্চলের পানি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তুলনামূলকভাবে দূরে থাকে, ফলে এর অভিকর্ষজ বিভব শক্তি বেশি থাকে। পানি যখন নিচের দিকে নামে, তখন সেই বিভব শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং প্রবাহ সৃষ্টি করে।

ভরযুক্ত যে কোনো বস্তুর গতি থাকলে সেটির থাকে গতিশক্তি। তাই প্রবাহিত পানির গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব। পানির বিভব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। যখন কোনো বস্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে তোলা হয়, তখন আমরা অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কাজ করি; ফলে বস্তুটি বিভব শক্তি অর্জন করে। সেটিকে ছেড়ে দিলে সেই বিভব শক্তি আবার গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং কাজ করতে সক্ষম হয়।

বিভব শক্তির সূত্রঃ

$E_p = mgh$

যেখানে,

E_p = বিভব শক্তি

m = ভর (kg)

g = অভিকর্ষজ ত্বরণ (9.8 m/s^2)

h = উচ্চতা (m)

শক্তির নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী,

বিভব শক্তি = গতিশক্তি

$E_p = E_k$
অথবা, $mgh = 0.5\ mv^2$
যখন বাঁধ দিয়ে নদীর প্রবাহিত পানিকে আটকানো হয়, তখন পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এবং এতে বিভব শক্তি জমা হয়। সাধারণত কোনো পাহাড়ি উপত্যকার নিচু প্রান্তে বাঁধ তৈরি করে পানির সঞ্চয় করা হয়। বাঁধের পেছনে একটি কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি হয়। হ্রদ পূর্ণ হলে, সেই পানি একটি মোটা পাইপের (penstock) মাধ্যমে নিচে অবস্থিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে পাঠানো হয়। নিচে পড়ার সময় পানির বিভব শক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হয় এবং এই গতিশক্তির মাধ্যমে একটি টারবাইন ঘোরানো হয়। টারবাইন একটি ব্লেডযুক্ত চাকা, যা সরাসরি একটি তড়িৎ জেনারেটরের সাথে সংযুক্ত থাকে। টারবাইন ঘোরার ফলে জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, যা পরে তারের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়।

একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে আনুমানিক শক্তি উৎপাদনের জন্য একটি সরল সূত্র হলো:
$P = \eta\ (\rho V g \Delta h)$
যেখানে,
P = উৎপাদিত বিদ্যুৎ (ওয়াট)
η = যন্ত্রের কর্মদক্ষতা (0 থেকে 1 এর মধ্যে)
ρ = পানির ঘনত্ব (প্রায় 1000 kg/m^3)
V = পানির আয়তনিক প্রবাহ হার (m^3/s)
g = অভিকর্ষজ ত্বরণ (9.8 m/s^2)
Δh = উচ্চতার পার্থক্য (m)

বিকল্পভাবে, ভরের মাধ্যমে প্রকাশ করলে:
$P = \eta\ (mg\Delta h)$
যেখানে, m = ভর প্রবাহ হার (kg/s)

বিভিন্ন আকারের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র

বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কতটুকু ক্ষমতাসম্পন্ন হলে তাকে 'বড়' বলা যাবে, তার নির্দিষ্ট কোনো সর্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ড নেই। তবে সাধারণভাবে কয়েকশ' মেগাওয়াট থেকে শুরু করে ১০ গিগাওয়াট বা তার বেশি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রগুলোকে 'বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
বর্তমানে বিশ্বে একাধিক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে, যেগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা ১০ গিগাওয়াটের বেশি। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো:
(১) থ্রি জর্জেস ড্যাম (চীন) ২২.৫ গিগাওয়াট
(২) ইটাপু ড্যাম (ব্রাজিল-প্যারাগুয়ে সীমান্ত) ১৪ গিগাওয়াট
(৩) গুরি ড্যাম (ভেনেজুয়েলা) ১০.২ গিগাওয়াট

বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোই সাধারণত সর্বাধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং অনেক সময় এসব কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিগুণ বা তার চেয়েও বেশি হতে পারে।

ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র

যদিও বৃহৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের বড় অংশ সরবরাহ করে, তবে ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রও কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাধারণভাবে, ১০ মেগাওয়াট বা তার কম ক্ষমতার কেন্দ্রকে ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বলা হয়। তবে দেশ ভেদে এটি ভিন্ন হতে পারে, যেমন উত্তর আমেরিকায় এই সীমা ৩০ মেগাওয়াট পর্যন্ত গৃহীত হয়। একটি ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র একটি জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডের সাথে যুক্ত থাকতে পারে কিংবা কোনো বিচ্ছিন্ন এলাকা বা এমনকি একটি একক বাড়ির জন্যও তৈরি হতে পারে। ছোট প্রকল্প তুলনামূলকভাবে কম জটিল ও সস্তা হতে পারে। ফলে এই প্রকল্পগুলো তুলনামূলকভাবে দ্রুত, কম ব্যয়ে এবং সহজভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। অনেক সময় ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে সমন্বয় করে তৈরি করা হয়। এতে করে একদিকে যেমন প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজ হয়, তেমনি খরচও কমে আসে। বিশ্বব্যাপী চীনে সবচেয়ে বেশি ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। মোট বিশ্বজুড়ে ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রায় ৫০% ই চীনে অবস্থিত।

জলবিদ্যুতের সুবিধা

(১) কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন

জলবিদ্যুতের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে, এটি খুব স্বল্প খরচে উৎপাদন করা যায়। একবার স্থাপন করে নিলে, এটি দীর্ঘ সময় ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। বর্তমানে বিশ্বের অনেক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে যেগুলো ৫০ থেকে ১০০ বছর আগে নির্মিত হলেও এখনো কার্যকরভাবে কাজ করছে। এটি অনেকাংশেই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হওয়ায় শ্রমিক খরচ কম পড়ে। এমনকি অনেক বড় কেন্দ্রেও খুব অল্পসংখ্যক জনবল দিয়ে পরিচালনা সম্ভব। যদিও প্রাথমিক নির্মাণ ব্যয় কিছুটা বেশি হতে পারে, তবে এটি দ্রুত ফেরত আসে। যেমন, চীনের ত্রি জর্জেস বাঁধ থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিক্রির মাধ্যমে এর নির্মাণ ব্যয় মাত্র ৫৮ বছরের মধ্যেই উঠে এসেছে বলে জানা যায়।

(২) কম গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালাতে কোনো জ্বালানির (যেমন কয়লা, গ্যাস, তেল) পোড়ানো লাগে না, ফলে এখান থেকে সরাসরি কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) বা অন্যান্য গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন হয় না। যন্ত্রপাতি তৈরি ও কেন্দ্র নির্মাণের সময় সামান্য পরিমাণ CO_2 নির্গত হয় ঠিকই, তবে সেটি অন্যান্য জ্বালানি-নির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্রের তুলনায় অনেক কম।

ইউরোপিয়ান কমিশনের অর্থায়নে পরিচালিত ExternE (Externalities of Energy) নামক একটি গবেষণা প্রকল্প অনুযায়ী, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হলো বিশ্বের

তালিকাটি নিম্নরূপ:

ক. জলবিদ্যুৎ

খ. বায়ুশক্তি

গ. পারমাণবিক শক্তি

ঘ. সৌরশক্তি

(৩) অফুরন্ত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস

জলবিদ্যুৎ হলো প্রবহমান শক্তি (Flow Energy) এটি অফুরন্ত ও প্রকৃতিনির্ভর। অন্যদিকে, কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম ইত্যাদি হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু বা সঞ্চিত শক্তি (Exhaustible or Fund Energy), যা একবার ব্যবহার করলে পুনরায় তৈরি হয় না।

(৪) পরিবেশবান্ধব ও দূষণহীন শক্তি

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় ধোঁয়া, ছাই বা কোনো বর্জ্য পদার্থ নির্গত হয় না, ফলে এটি পরিচ্ছন্ন শক্তি (Clean Energy) হিসেবে বিবেচিত। বিপরীতে, কয়লা ও খনিজ তেল পোড়ানোর সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, ছাই ইত্যাদি দূষণকারী পদার্থ নির্গত হয়, যা পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

(৫) উচ্চ তাপশক্তি উৎপাদনে সক্ষম

জলবিদ্যুৎ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে উচ্চ মানের তাপশক্তি পাওয়া যায়। বিশেষ করে, অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন শিল্পসহ যেসব ভারী শিল্পে প্রচুর তাপশক্তির প্রয়োজন হয়, সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান সাধারণত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছাকাছি স্থাপন করা হয়।

(৬) পরিবহন সুবিধা ও অপচয়হীন সরবরাহ

কয়লা বা খনিজ তেলের মতো কাঁচামালকে পরিবহনের জন্য ট্রাক, রেলগাড়ি, নৌযান বা পাইপলাইন প্রয়োজন হয়, যেখানে সময়, অর্থ এবং শক্তি অপচয় হয়। কিন্তু জলবিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন লাইনের মাধ্যমে সরাসরি উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিতরণ কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া যায়, এতে অপচয় অনেক কম হয়।

(৭) কাঁচামাল সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কোনো জ্বালানি বা কাঁচামাল সংরক্ষণের প্রয়োজন পড়ে না। অন্যদিকে, কয়লা, তেল ও গ্যাসের মতো জ্বালানিগুলোকে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করতে হয়, যার জন্য গুদামঘর, সুরক্ষা ও অতিরিক্ত খরচ প্রয়োজন হয়।

(৮) কম শ্রমশক্তির প্রয়োজন

জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় ও নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এখানে মানবশ্রমের প্রয়োজন খুব কম। বিপরীতে, খনিজ জ্বালানির উত্তোলন, পরিশোধন ও পরিবহন থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে প্রচুর শ্রমশক্তি ও জনবল প্রয়োজন হয়।

(৯) বিভাজ্যতা (Divisibility) বেশি

জলবিদ্যুৎ শক্তির বিভাজ্যতা অনেক বেশি। আধুনিক যান্ত্রিক প্রযুক্তির সাহায্যে এক ওয়াট শক্তিকেও প্রয়োজন অনুযায়ী হাজার ওয়াট বা মিলিওয়াটে সহজেই রূপান্তর করা যায়। এই কারণে উন্নত যন্ত্রপাতি ও অত্যাধুনিক শিল্প যেমন: ইলেকট্রনিক্স, মেডিকেল যন্ত্র, রোবোটিক্স ইত্যাদিতে জলবিদ্যুৎ ব্যবহার অধিকতর কার্যকর।

জলবিদ্যুতের অসুবিধাসমূহ

(১) পরিবেশগত প্রভাব ও মানুষের বাস্তুচ্যুতি

একটি বৃহৎ জলবিদ্যুৎ কমপ্লেক্স নির্মাণে অনেক সময় আবাদযোগ্য জমি হারিয়ে যায় এবং স্থানীয় জনগণকে বাধ্যতামূলকভাবে স্থানচ্যুত হতে হয়। এতে করে মানুষের জীবনধারা ও আয়ের উৎসে গুরুতর প্রভাব পড়ে। এছাড়াও, প্রকল্প-সম্পৃক্ত নদীগুলোর প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রে ব্যাঘাত ঘটে যেমন:

(ক) নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হয়;
(খ) পলি জমা ও ভাঙনের ধরণ পাল্টে যায়;
(গ) মাছের আবাস ও চলাচলে বাধা তৈরি হয়।

(২) বাঁধ ভেঙে পড়ার বিপর্যয়কর সম্ভাবনা

যদিও বাঁধ বন্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক, তবুও বাঁধ ধ্বংস একটি ভয়াবহ মানবসৃষ্ট দুর্যোগ হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ:

(ক) ১৯৭৫ সালে চীনের বাঙ্কিয়াও বাঁধ ভেঙে পড়ে প্রায় ২৬,০০০ মানুষ নিহত হয় এবং লক্ষাধিক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে;
(খ) ১৯৬৩ সালে ইতালির ভায়োন্ট বাঁধ ধসে গিয়ে প্রায় ২,০০০ মানুষ মারা যায়।
এই দুর্ঘটনাগুলো প্রমাণ করে, উন্নত নকশা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের পরও বাঁধ শতভাগ নিরাপদ নয়।

(৩) বন্যপ্রাণী, বিশেষত বাঘ ও জাগুয়ারের বাসস্থান ধ্বংস

সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বাঁধ নির্মাণের ফলে বিশ্বব্যাপী বাঘ এবং জাগুয়ারের বাসস্থান ধ্বংস হচ্ছে।
(ক) এশিয়ায় মোট বাঘের এক-পঞ্চমাংশ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে;
(খ) কিছু দেশে বাঘের সংখ্যা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে;
(গ) দক্ষিণ আমেরিকার জাগুয়ার (চিতাবাঘ) এর বিচরণক্ষেত্রেও চারগুণ বেশি হুমকি তৈরি হয়েছে।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে, শুধুমাত্র জলাধার তৈরির জন্য ১৩,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাঘের আবাস পানিতে তলিয়ে গেছে। ব্রাজিলে এক গবেষণায় বলা হয়েছে: জাগুয়ারের বিচরণ ক্ষেত্রের ২৫,০০০ বর্গকিলোমিটার ইতোমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাজানের অরণ্যে জাগুয়ারদের আবাসভূমির উপর প্রায় ৩০০টি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এতে বিস্তৃত বন্যপ্রাণী বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসের ঝুঁকি রয়েছে। বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তুলেছেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সত্যিই এসব পরিবেশগত ক্ষতির চেয়ে বেশি

(৪) বাস্তুতন্ত্র খণ্ডায়ন ও দ্বীপে পরিণত অরণ্য

জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় রাস্তাঘাট ও নির্মাণকাজ চালাতে গিয়ে অখণ্ড অরণ্য বিভক্ত হয়ে পড়ে। এতে করে বন্যপ্রাণীরা বিচ্ছিন্ন ও বিচরণহীন হয়ে পড়ে। থাইল্যান্ডের চিউ লান প্রকল্পে, ১৯৮০-এর দশকে ১৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা পানিতে ডুবে যায়, এর ফলে ১০০টিরও বেশি দ্বীপ সৃষ্টি হয় এবং বাঘগুলো এলাকা ছেড়ে চলে যায়। খণ্ড খণ্ড জঙ্গল বাঘ বা অন্যান্য বৃহৎ প্রাণীদের টিকে থাকার জন্য উপযুক্ত নয়।





ছবি: প্রথম ছবি হলো থাইল্যান্ডের চিউ লান লেক। এখানে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য বাঘের বিচরণভূমিতে তৈরি করা হয় বিশাল এক জলাধার এবং দ্বিতীয় ছবি হলো ব্রাজিলের বালবিনায় একটি বাঁধ যা নির্মাণের জন্য প্রায় ৩,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা পানিতে তলিয়ে দেয়া হয়। এই জায়গায় একসময় জাগুয়ার বিচরণ করতো

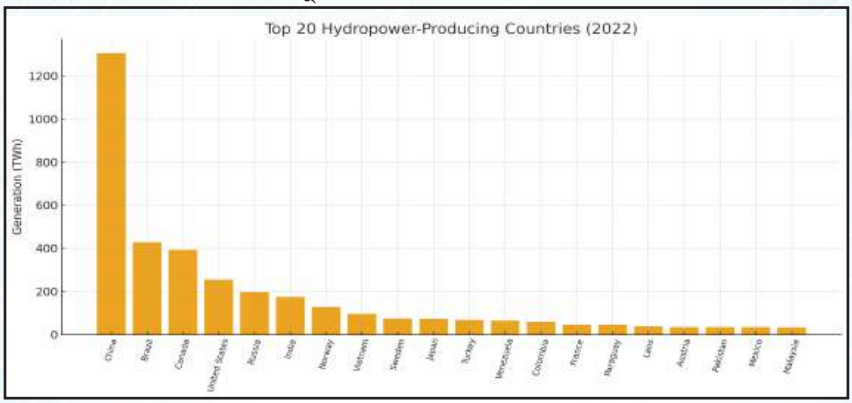
দেশে দেশে জলবিদ্যুৎ ব্যবহার

ব্রাজিল, কানাডা, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড এবং ভেনেজুয়েলা–এই দেশগুলোতে জলবিদ্যুৎই বিদ্যুৎশক্তির প্রধান উৎস। বিশ্বে একমাত্র প্যারাগুয়ে এমন একটি দেশ, যেখানে বিদ্যুৎ শক্তির ১০০% উৎসই জলবিদ্যুৎ। শুধু তাই নয়, দেশটি তার মোট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ৯০% বিদ্যুৎ প্রতিবেশী দেশগুলো–যেমন ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনায় রপ্তানি করে। নরওয়ে তার মোট বিদ্যুতের প্রায় ৯৮-৯৯% জলবিদ্যুৎ থেকে উৎপাদন করে। সারা বিশ্বে ২০২২ সালে মোট ৪,২৮৯ টেরাওয়াট-ঘণ্টা (TWh) বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছে জলবিদ্যুৎ থেকে, যা বিশ্বের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ১৫% এবং নবায়নযোগ্য শক্তির প্রায় অর্ধেক।

বিশ্বের মোট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের মধ্যে চীন শীর্ষে রয়েছে। দেশটি প্রতি বছর তার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে প্রায় ১৩০৫ টেরা ওয়াট-ঘণ্টা (TWh) বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, যা তাদের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ৩০%।

এর পরের অবস্থানগুলোতে রয়েছে–
ব্রাজিল: ১০%
কানাডা: ৯.২%
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: ৫.৮%
রাশিয়া: ৪.৬%

২০২২ সালের সর্বোচ্চ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ২০টি দেশ



ক্রমিক	দেশ	বার্ষিক জলবিদ্যুৎ উৎপাদন (TWh)	ক্রমিক	দেশ	বার্ষিক জলবিদ্যুৎ উৎপাদন (TWh)
১.	চীন	1,305.89	১১.	তুরস্ক	66.75
২.	ব্রাজিল	427.11	১২.	ভেনেজুয়েলা	64.51
৩.	কানাডা	392.45	১৩.	কলম্বিয়া	58.73
৪.	যুক্তরাষ্ট্র	254.79	১৪.	ফ্রান্স	44.61
৫.	রাশিয়া	197.35	১৫.	প্যারাগুয়ে	43.87
৬.	ভারত	173.43	১৬.	লাওস	38.74
৭.	নরওয়ে	127.62	১৭.	অস্ট্রিয়া	34.71
৮.	ভিয়েতনাম	95.93	১৮.	পাকিস্থান	34.58
৯.	সুইডেন	72.80	১৯.	ম্যাক্সিকো	33.83
১০.	জাপান	71.81	২০.	মালায়েশিয়া	32.75

প্রধান সূত্রঃ The Global Economy (which uses EIA country data)



ছবিঃ The Three Gorges Dam in Central China is the world's largest power-producing facility of any kind. m~i: ইন্টারনেট

বর্তমানে, ১০ গিগাওয়াট (১০,০০০ মেগাওয়াট) এর বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে এমন বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির তালিকা

Rank	Station	Country	Location	Capacity (MW)
1.	Three Gorges Dam	China	30°49′15″N 111°00′08″E	22,500
2.	Baihetan Dam	China	27°13′23″N 102°54′11″E	16,000
3.	Itaipu Dam	Brazil/ Paraguay	25°24′31″S 54°35′21″W	14,000
4.	Xiluodu Dam	China	28°15′35″N 103°38′58″E	13,860
5.	Belo Monte Dam	Brazil	03°06′57″S 51°47′45″W	11,233
6.	Guri Dam	Venezuela	07°45′59″N 62°59′57″W	10,235
7.	Wudongde Dam	China	26°20′2″N 102°37′48″E	10,200

সূত্র: ইন্টানেট

বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র – কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র

বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এটি রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলায়, চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার উজানে কর্ণফুলি নদীর উপর নির্মিত একটি বাঁধ। বাংলাদেশে (তৎকালীন ব্রিটিশ ভারত) ১৯০৬ সালে সর্বপ্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫১ সালে তৎকালীন সেচ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী খাজা আজিমুদ্দিনের তত্ত্বাবধানে বাঁধ নির্মাণের স্থান হিসেবে কাপ্তাইকে নির্বাচিত করা হয়। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে বাঁধের নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং ১৯৬২ সালে ৪০ মেগাওয়াট করে দুটি ইউনিট নিয়ে কেন্দ্রটির উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়।

পরবর্তীকালে ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন আরও তিনটি ইউনিট স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে তৃতীয় ইউনিটটি ১৯৮২ সালে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম ইউনিট দুটি ১৯৮৭ সালে চালু হয়। প্রথম তিনটি ইউনিট স্থাপন করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিতে, আর পরবর্তী দুটি ইউনিট স্থাপন করে জাপানের টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার সার্ভিসেস কোম্পানি (TEPSCO)। এই দুটি ইউনিট স্থাপনের সময়ই ভবিষ্যতে আরও দুটি ইউনিট স্থাপনের জন্য আনুষঙ্গিক সুবিধা রেখে দেওয়া হয়। ১৯৯৮ সালে TEPSCO একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করে জানায় যে, বর্তমান অবকাঠামো ও কাপ্তাই হ্রদের পানির সাহায্যে আরও দুটি ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ইউনিট বসানো সম্ভব। এতে উৎপাদন খরচ আরও কমে আসবে। বর্তমানে (সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী) কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট উৎপাদনক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াট, এবং গড়ে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ প্রায় ২০ পয়সা, যা দেশের সর্বনিম্ন ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ উৎপাদন উৎসগুলির একটি।





ছবি: রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলায় অবস্থিত কর্ণফুলী নদীতে কৃত্রিম কাপ্তাই হ্রদের উপর নির্মিত বাঁধ (প্রথম ছবি ১৯৬৫ ও দ্বিতীয় ছবি ২০২০ সালের কাপ্তাই বাঁধ)

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, যদি স্থায়ী অধিবাসীদের বাস্তুচ্যুতি, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যহীনতা, পলি জমা ও ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়, তবে যেকোনো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী ও টেকসই শক্তির উৎসে রূপান্তর করা সম্ভব। জলবিদ্যুৎ কম খরচে দীর্ঘদিন ধরে বৈদ্যুতিক শক্তির অন্যতম নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এটি একটি পরিচ্ছন্ন, কার্যকর এবং নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস, যা বিশ্বব্যাপী জ্বালানি নিরাপত্তা ও পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেও জলবিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে গবেষণা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও পরিবেশসম্মত পরিকল্পনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও কার্যকর ও টেকসই অবদান রাখা সম্ভব।

তথ্যসূত্র (References):

1.International Hydropower Association (IHA), Hydropower Status Report 2024

2.Power Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, Bangladesh

3.UN Sustainable Development Goals (SDG-7)

4.Bangladesh Power Development Board (BPDB) Annual Report

5.Rahman, M. M. (2021). "Hydropower Prospects in the Chittagong Hill Tracts". Energy Policy Journal.

6.বিবিসি ওয়ার্ল্ড

7. উইকিপিডিয়া

লেখক:

এম.এম. রুবায়েত হোসেন

সহকারী কিউরেটর

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, ঢাকা।

পুস্তক পর্যালোচনা

পুস্তকের নাম: দ্য থিওরি অব এভরিথিং

লেখক: স্টিফেন হকিং

মো: খাইরুল ইসলাম



"দ্য থিওরি অব এভরিথিং" বইটি স্টিফেন হকিংয়ের ধারাবাহিক সাতটি বক্তৃতা নিয়ে প্রকাশিত এমন একটি সংকলন যেখানে তিনি সহজ-সরলভাবে মহাবিশ্বের সূচনা থেকে এর শেষ পরিণতি কী হতে পারে তা তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি মহাবিস্ফোরণ, কৃষ্ণগহ্বর, স্থান-কাল নিয়ে আলোচনা করে একটি একীভূত তত্ত্ব খুজে বের করতে চেয়েছেন, যার মাধ্যমে শুধুমাত্র বিজ্ঞানীরা নয় বরং সকল মানুষ মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণ পেতে পারেন।

মহাবিশ্বের সূচনা এবং এর ক্রম পরিণতি সম্পর্কে আমাদের জানার আগ্রহের শেষ নেই। কিন্তু কে সমাধান দিবে এই প্রশ্নের? মানব মনের অজানা প্রশ্নের উত্তর খুজতেই বিজ্ঞানীদের এই অত্মত্যাগ। ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুসলিম প্রায় সকল ধর্মীয় গ্রন্থে মহাবিশ্ব সৃষ্টির কথায় বলা হয়েছে। সম্ভবত মানুষ ও মহাবিশ্ব একই সময়ে হয়েছিল, অন্যথায় আমরা বর্তমানের চেয়ে আরও এগিয়ে যেতাম।

যদি মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল হয় তবে এর পেছনে অবশ্যই একটি শুরুর কারণ থাকবে। হয় সৃষ্টিকর্তা তাৎক্ষণিক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন অথবা তিনি পরবর্তীতে এমন করেও সৃষ্টি করতে পারেন যেন এটি মহাবিস্ফোরণ দ্বারাই সৃষ্ট। সম্প্রসারণশীল এই মহাবিশ্ব সৃষ্টিকর্তাকে উপেক্ষা করে না, কিন্তু একটি সীমাবদ্ধতার কথা জানিয়ে দেয়- কখন তিনি এটি করেছেন?

বর্তমান পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রমান-উপাত্তের ভিত্তিতে এটি বলা যায়- সম্ভবত মহাবিশ্ব চিরতরে সম্প্রসারিত হতে থাকবে। কিন্তু এটি চূড়ান্ত নয়। এটি সম্পর্কে আমরা তখনই নিশ্চিত হতে পারব যদি কখনো মহাবিশ্ব পুনঃসংকুচিত হয়। তবে তা কমপক্ষে দশ হাজার মিলিয়ন বছরের আগে ঘটবে না। আমাদের সূর্যের মৃত্যু ঘটার মাধ্যমে মানবজাতি যদি মৃত্যুমুখে পতিত না হয় তাহলে মানবজাতি হয়তো সৌরজগতের বাইরে কোনো কলোনিতে পাড়ি জমাবে।

পৃথিবী গোলাকার বলের মতো নাকি সমতল থালার মত এ নিয়ে সর্বপ্রথম বিতর্ক উপস্থাপন করেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী এরিস্টটল। চাঁদের বুকে পৃথিবীর গোলাকার ছাঁয়া, সমতলে যেকোনো পর্যবেক্ষক দূর সমুদ্রে প্রথমে জাহাজের পাল, পরে তার কাঠামো দেখতে পায় এসব বিষয় প্রাথমিকভাবে প্রমাণ করে পৃথিবী গোলাকার।

এরিস্টটল মনে করতেন পৃথিবী স্থির এবং সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র পৃথিবীর চারপাশে বৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করে। একইভাবে টলেমিও একটি মহাজাগতিক মডেল উপস্থাপন করেন যেখানে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ৮টি গোলক কল্পনা করেন। এরপর কোপার্নিকাস প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে গিয়ে নতুন একটি ধারনা প্রদান করেন যেখানে পৃথিবী এবং গ্রহসমূহ বৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং সূর্য কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির থাকে।

গ্যালিলিও যখন নিজ টেলিস্কোপ দ্বারা বৃহস্পতি গ্রহকে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন এর কিছু উপগ্রহ তাকে পরিবেষ্টন করে ঘুরছে তখন তিনি বলেন, সকল গ্রহকে পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত কক্ষপথে থাকার প্রয়োজন নেই।

নিউটন তার 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা ন্যাচারাল কজেস' বইয়ে উল্লেখিত গাণিতিক সূত্রানুসারে দেখান চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে এবং পৃথিবী ও গ্রহসমূহ সূর্যের চারপাশে উপবৃত্তার পথ অনুসরণ করে।

১৯৬৯ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী জন হুইলার সর্বপ্রথম কৃষ্ণগহ্বরের কল্পিত ছবি উপস্থাপন করে যা অন্তত দুশ বছর পেছনে যাওয়ার ধারণার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। কীভাবে কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্ট হয়েছে তা বুঝতে প্রথমত আমাদের নক্ষত্রের জীবনচক্র বোঝা দরকার। কিছু কিছু নক্ষত্র এত বড় এবং মহাকর্ষ বল দ্বারা এমনভাবে সংহত যে আলোও নিষ্কৃতি পায় না। এসব নক্ষত্রের পৃষ্ঠ থেকে আলো বিকিরিত হয়ে পুনরায় ফিরে আসে প্রবল মহাকর্ষ বলের প্রভাবে। এ ধরণের নক্ষত্রসমূহকে কৃষ্ণগহ্বর বলে বিবেচনা করা হয়। কৃষ্ণগহ্বর আক্ষরিকভাবে কালো বলে মনে হলেও সেগুলো উত্তপ্ত বস্তুর মতো অগ্নিপিণ্ড এবং সেগুলো যত ছোট তত উত্তপ্ত অগ্নিপিন্ড। সুতরাং বৈজ্ঞানিকভাবে ছোট কৃষ্ণগহ্বর বাস্তবিকপক্ষে এক একটি বড় কৃষ্ণগহ্বরের চেয়ে সহজে নির্ণয় করা যায়। কৃষ্ণগহ্বর প্রায় দশ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন শক্তি বিকিরণ করে।

কৃষ্ণগহ্বর ও এর বিকিরণ, বিস্ফোরণ এগুলো নিয়ে আরো বিস্তর গবেষণা চলছে। হয়তো এই গবেষণায় একদিন আদিম কৃষ্ণগহ্বরের খোঁজ এনে দিবে। অনেক মানুষ এই ধারনা পছন্দ করে না যে সময়ের একটি শুরু আছে। কিন্তু বিতর্ক এড়াতে এটা বলা যায় মহাবিস্ফোরণের শুরুতেই সময়ের শুরু। এটা বলায় উচিৎ হবে যে, সময়ের শুরু এবং মহাবিশ্বের শুরুটা কেমন ছিল তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তার উপরই নির্ভরশীল। মহাবিশ্ব যখনই শুরু হোক না কেনো এটির একটি পরমবিন্দু আছে। কিন্তু যদি মহাবিশ্ব নিজেই নিজের সবকিছু ধারণ করে, যদি এর কোনো সীমানা বা কিনারা না থাকে-

এটি সৃষ্টি বা ধ্বংস কোনোটিই সম্ভব নয়। এটি যেভাবে আছে যদি সেভাবেই থাকে তাহলে সৃষ্টিকর্তার অবস্থান কোথায়?

সময় নিয়ে আরো একটি প্রশ্ন মাথায় আসে তা হলো কেন আমাদের অতীতকে মনে রাখতে হয় কিন্তু ভবিষ্যৎকে নয়? অন্য কথায় কেন সময় এগিয়ে চলে? সময়ের চলে যাওয়াই কি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণশীলতাকে ইঙ্গিত করে? যদি মহাবিশ্ব পুনঃরায় সংকোচিত হয় তাহলে কি আমরা অতীতে ফিরে যাব?

সবশেষে বলা যায়, "দ্য থিওরি অব এভরিথিং" শুধু একটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নয় বরং এটি মানুষের জ্ঞানান্বেষণের এক অনন্য দলিল। এটি পাঠককে মহাবিশ্ব সম্পর্কে ভাবতে শেখায়, প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং জ্ঞানের গভীরে প্রবেশের অনুপ্রেরণা জোগায়। যদি কোনোদিন আমরা এমন একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারি যা মহাবিশ্বের সব রহস্য উন্মোচন করবে, তবে তা হবে মানবজাতির যুক্তিবাদী চিন্তার চূড়ান্ত বিজয়। আর সেই মুহূর্তে হয়তো আমরা অস্তিত্বের মৌলিক প্রশ্নগুলোরও উত্তর খুঁজে পাব।

লেখক:
মো: খাইরুল ইসলাম
প্রভাষক (পদার্থবিদ্যা)
মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ।

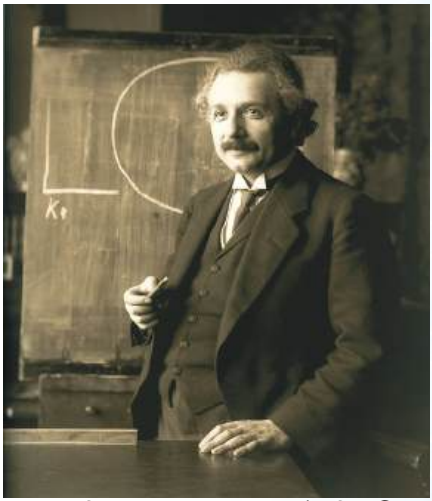
অমীমাংসিত বিজ্ঞান

রহস্যের নাম ডার্ক এনার্জি

আবুল বাসার

কিছুদিন আগে নতুন একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করে হইচই ফেলে দিয়েছেন গোটা বিজ্ঞানজগতে। সবার চোখে তিনি তখন তারকা বিজ্ঞানী। প্রায় এক দশক জোঁকের মতো লেগে ছিলেন এ তত্ত্বের পেছনে। রাত-দিন এক করে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ১৯১৬ সালে পৌঁছান এর চূড়ান্ত ক্ষেত্র সমীকরণে। সে তত্ত্বকে এখন বলা হয় আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম ভিত্তি। মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের অন্যতম নমুনা। তার নাম সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। বুঝতেই পারছেন কার কথা বলছি। তিনি আলবার্ট আইনস্টাইন।

খ্যাতির উত্তাপ পোহাতে পোহাতে ১৯১৭ সালের দিকে নিজের প্রণয়ন করা সেই সমীকরণ সমাধান করতে গেলেন আইনস্টাইন। তাতে নিজেরই মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হলো জার্মান এই পদার্থবিদের। কারণ, নিউটনের কাল থেকে শুরু করে তখনো পর্যন্ত বিশ্বাস করা হতো, মহাবিশ্ব স্থির। কিন্তু একি! তাঁর নিজের সমীকরণ বলছে উল্টো কথা! মানে সাধারণ আপেক্ষিকতার সমীকরণের সমাধান থেকে পাওয়া যাচ্ছে একটা গতিশীল মহাবিশ্ব। কিন্তু এ রকম হবে কেন? নিজের সমীকরণকে বিশ্বাস করতে পারলেন না আইনস্টাইন।



আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জনক জার্মান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন।

ব্যস! তাতে পাওয়া গেল একটা কাঙ্ক্ষিত স্থির মহাবিশ্ব। মনে শান্তি ফিরে পেলেন আইনস্টাইন। কিন্তু তিনি জানতেন না, এই গোঁজামিলের জন্য অচিরেই দুঃখ করতে হবে তাঁকে। জানতেন না, অন্য বিজ্ঞানীরা একে তুলনা করবেন কুৎসিত হাঁসের ছানার সঙ্গে। প্রায় এক দশক পর আইনস্টাইনের সাধের স্থির মহাবিশ্বকে স্রেফ ধসিয়ে দিলেন মার্কিন জ্যোতির্বিদ এডুইন হাবল। তিনি তখন কাজ করছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে। রাতের আকাশে অসংখ্য গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ করে একটা গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন। তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল, মহাবিশ্বের প্রতিটি গ্যালাক্সি একটা আরেকটার কাছ থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। সরল কথায়, মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ তা কোনোভাবেই স্থির হতে পারে না বরং গতিশীল। ফুলেফেঁপে ক্রমেই বড় হচ্ছে আকারে-আকৃতিতে। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের

মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে ১৯৩১ সালে সস্ত্রীক বেড়াতে এসে জনসম্মুখে নিজের ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হন আইনস্টাইন। বললেন, মহাজাগতিক ধ্রুবক ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।


১৯৩১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আইনস্টাইন এবং হাবল

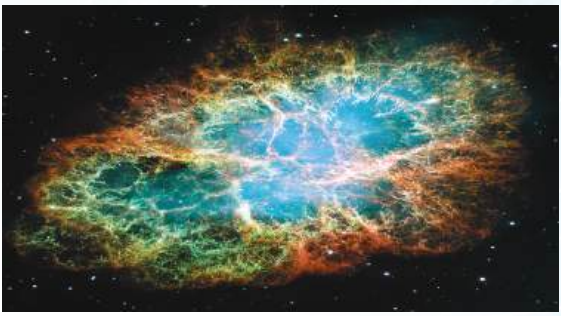
এই তো, এরপরই মহাজাগতিক ধ্রুবকের স্থান হলো বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতায়। বাতিলের তালিকায়। ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে! আইনস্টাইন মনে মনে দুঃখ পেলেও খুশি হলেন অন্য বিজ্ঞানীরা। কুচ্ছিত হাঁসের ছানাকে কে আর পছন্দ করে! কাজেই এরপরের বাক্যটা হওয়া উচিত ছিল–'অতঃপর, তাহারা সুখেশান্তিতে বসবাস করিতে লাগিল!' কিন্তু না, সেই সুখও তাঁদের কপালে বেশি দিন সইল না। কারণ দীর্ঘ প্রায় ৬৭ বছর পর পুনরুজ্জীবন পেল এই ধ্রুবক। সেই ফিরে আসাটাও যেনতেন সাধারণ ব্যাপার নয়, বলা যায়, মহাসমারোহে ফিরে আসা। তাও নতুন এক রহস্যের কাঁধে চড়ে। সেই রহস্যের পিছে দিন-রাত ছুটেও কোনো তল খুঁজে পেলেন না বিজ্ঞানীরা। এমনকি এখনো তা রহস্যের চাদরেই ঢাকা। বিজ্ঞানীদের কাছে যা এক দুঃস্বপ্নের মতো। কিন্তু কী সেই রহস্য? কেনই-বা বিজ্ঞানীদের কাছে তা দুঃস্বপ্নের মতো?

১৯৯৮ সাল। যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলির ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই দল বিজ্ঞানী একটা নতুন কিছু করার কথা ভাবলেন। শুরুতে কেউ কারও খবর রাখেননি। কিন্তু পরে দেখা গেল, দুই দলই বেছে নিয়েছে একই গবেষণার বিষয়। এদের একদল পদার্থবিজ্ঞানী। এর নেতৃত্বে ছিলেন সল পার্লমুটার। সবার কাছে দলটি পরিচিতি সুপারনোভা কসমোলজি প্রজেক্ট নামে। আরেক দল জ্যোতির্বিজ্ঞানী। এর নেতৃত্বে ছিলেন অ্যাডাম রিস এবং ব্রায়ান পল শ্মিট। এরা পরিচিত হাই-জেড সুপারনোভা সার্চ টিম, সংক্ষেপে হাই-জেড টিম নামে। শুরুতে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করলেও অচিরেই একদল আরেক দলের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল। দুই দলের মধ্যে শুরু হলো তীব্র প্রতিযোগিতা। বেশ রোমাঞ্চকর একটা ব্যাপার শুরু হলো বিজ্ঞান জগতে।

সে সময় মহাবিশ্বের প্রসারণ নিয়ে কারও মনে কোনো সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ তখন বিজ্ঞানীদের ঝুলিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের মনে তখন উদয় হয়েছে নতুন এক জিজ্ঞাসা। সেটি হলো: মহাবিশ্ব শেষ পরিণতি কী? মহাবিশ্ব কি চিরকাল এভাবেই প্রসারিত হতে থাকবে, নাকি একটা বিশেষ পর্যায়ে তা উল্টো দিকে যাত্রা শুরু করবে? মানে সংকুচিত হতে শুরু করবে।

হিসাব কষে দেখা গেল, মহাবিশ্বে যদি পর্যাপ্ত শক্তি ঘনত্ব থাকে, তাহলে এর প্রসারণ একসময় থেমে যাবে। তারপর চুপসে যেতে শুরু করবে মহাবিশ্ব। কিংবা শক্তি ঘনত্ব যদি কম থাকে, তাহলে এর প্রসারণ কখনো থামবে না। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রসারণকে কমিয়ে দিতে পারবে মহাকর্ষ। কারণ, মহাকর্ষ সবকিছুকেই টেনে একত্র

করার চেষ্টা করবে। কিন্তু বাস্তবে কী ঘটবে?–সে উত্তর পেতে বিজ্ঞানীদের অবশ্যই জানতে হবে, মহাবিশ্ব আসলে কত দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে।



সেটা জানার একটা উপায় হলো গ্যালাক্সি বা ছায়াপথগুলো কী হারে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তা হিসাব করা। সেটা করার উপায় হলো গ্যালাক্সিদের ডপলার ইফেক্ট মাপা। এই পদ্ধতিতেই রাস্তায় গাড়ির গতি মাপে পুলিশ। এটা মাপা হয় শব্দের বিচ্যুতি মেপে। তবে আলোরও ডপলার ইফেক্ট আছে। একই উপায়ে যে গ্যালাক্সি যত দ্রুত সরে যাবে, তার আলোয় তত বেশি লোহিত বিচ্যুতি পাওয়া যাবে। মানে বর্ণালি রেখায় সব রঙের আলো লাল প্রান্তের দিকে সরে যাবে। গ্যালাক্সি থেকে আসা আলো তত বেশি লাল হতে থাকবে। এককালে এডুইন হাবলও এই পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রসারণশীল মহাবিশ্বের প্রমাণ দাখিল করেছিলেন।

কিন্তু মহাবিশ্বের কোনো বস্তু বা গ্যালাক্সি আমাদের কাছ থেকে দূরে রয়েছে, তা বোঝা যায় কীভাবে? ধরা যাক, মহাকাশে একটা বস্তু হয়তো আমাদের খুব কাছেই, কিন্তু তার আলো ম্লান। অন্যদিকে অনেক দূরে থাকা কোনো বস্তু যদি পর্যাপ্ত উজ্জ্বল হয়, তাহলে কাছের সেই ম্লান বস্তুর মতোই মনে হবে। অর্থাৎ আমাদের মনে হবে, দুটি বস্তুর দূরত্ব একই। তাহলে এর সমাধান কী?

এই বিভ্রান্তি থেকে জ্যোতির্বিদদের উদ্ধার করেছিলেন মার্কিন জ্যোতির্বিদ হ্যানরিয়েটা লেভিট। সে জন্য তিনি ব্যবহার করেছিলেন খুব বুদ্ধিদীপ্ত পদ্ধতি। এর সমাধান দিতে পারে সেফিড ভ্যারিয়েবল স্টার বা শেফালি বিষম তারা। সেফিড স্টারের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বা দীপ্তি বিজ্ঞানীদের জানা। এ ধরনের তারাগুলোর উজ্জ্বলতা সব সময় এক রকমই হয়। কাজেই কোনো গ্যালাক্সিতে একটা সেফিড স্টার খুঁজে পাওয়া গেলে তাকে অন্য কোনো নক্ষত্র বা অন্য কোনো সেফিড স্টারের দীপ্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়। দূরত্ব যত বাড়ে, তার দীপ্তি তত কম হবে। বা আমাদের কাছে তত বেশি ম্লান দেখাবে। এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কটা বর্গীয় হারের। কোনো বস্তু যত দূরে, সেটি ম্লান হবে দূরত্বের বর্গ হিসেবে। যেমন ধরা যাক, দুটি সেফিডের একটির তুলনায় আরেকটি যদি ৯ ভাগ ম্লান হয়, তাহলে তুলনামূলক ম্লানটি অন্যটির চেয়ে তিন গুণ বেশি দূরত্বে অবস্থিত। সে কারণে সেফিড স্টারকে বলে হয় মহাকাশের আদর্শ বাতি বা স্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডেল। মহাবিশ্বের বিভিন্ন গ্যালাক্সির কোনটা আমাদের কাছ থেকে কত দূরে রয়েছে, সেটা মাপতে হাবল ব্যবহার করেছিলেন এই পদ্ধতি।

এককালে মহাকাশে কোনো বস্তুর দূরত্ব মাপার জন্য এটিই ছিল আদর্শ পদ্ধতি। কিন্তু মহাবিশ্বের বহু বহু দূরের কোনো শেফালি তারা খুব ম্লান দেখা যায়। তাতে অনেক বেশি দূরত্বে এ তারাকে আদর্শ বাতি হিসেবে ব্যবহার করা বিজ্ঞানীদের জন্য একসময় দুরূহ হয়ে উঠল। কাজেই নতুন আদর্শ বাতি আবিষ্কার হয়ে উঠেছিল সময়ের দাবি। বিজ্ঞানের মজা হলো কোনো সমস্যার পেছনে লেগে থাকলে একসময় না একসময় তার সমাধান খুঁজে পান বিজ্ঞানীর। নতুন আদর্শ বাতির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। অচিরেই বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন সুপারনোভা হতে পারে মহাবিশ্বের বহু বহু দূরের বস্তুর জন্য আদর্শ বাতি। সেটা কী রকম?

তার আগে জানতে হবে সুপারনোভা কী? কেন? এবং কীভাবে? অতি ভারী কোনো নক্ষত্রের মৃত্যু ঘনিয়ে এলে একটা চরম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তখন নক্ষত্রটির সবটুকু জ্বালানি শেষ হয়ে গেছে। জ্বালানি মানে, নক্ষত্রের প্রাণভোমরা হাইড্রোজেন পরমাণু। নক্ষত্রের বুকে বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেনকে প্রবলভাবে পরস্পরের কাছে টেনে আনে মহাকর্ষ বল। তৈরি হয় একটা কেন্দ্রমুখী বল। এতে হাইড্রোজন পরমাণুদের চিড়েচ্যাপ্টা দশা শুরু হয়। এ পর্যায়ে দুটি হাইড্রোজেন পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লেগে যায়। তৈরি হয় হিলিয়াম পরমাণু। এ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় বিপুল শক্তি—অর্থাৎ প্রচণ্ড তাপ ও আলো। মুহুর্মুহু হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের মতো ঘটনা এটা। যেমন আমাদের সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রায় ১৫ মিলিয়ন কেলভিন। সেখানে সেকেন্ডে এক বিলিয়নের বেশি হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের সমতুল্য হারে শক্তি উৎপাদিত হয়। অতি ভারী নক্ষত্রের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ আরও অনেক অনেক বেশি।

যাই হোক, এই প্রচণ্ড তাপ নক্ষত্রের বুকে থাকা সবকিছুকে ঠেলে দেয় বাইরের দিকে। মানে মহাকর্ষের ঠিক বিপরীতে দিকে। নক্ষত্রের বুকে এই দুই বিপরীত বলের ঠেলাঠেলি সব সময়ই চলছে। এই ঠেলাঠেলির মধ্যে ভারসাম্য এলেই নক্ষত্রটা টিকে থাকে দীর্ঘদিন। আমাদের সূর্যও ঠিক এভাবেই টিকে আছে প্রায় ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি বছর, টিকে থাকবে আরও প্রায় ৫ বিলিয়ন বছর। কিন্তু নক্ষত্রের হাইড্রোজেন জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে কী হয়? তখন শুরু হয় হিলিয়াম চক্র। মানে হিলিয়াম পরমাণুরা আগের মতো চিড়েচ্যাপ্টা হতে থাকে। তৈরি হয় আরও ভারী মৌল। একসময় হিলিয়ামও ফুরিয়ে যায়। তখন শুরু হয় কার্বন চক্র।

কিন্তু এভাবে ক্রমান্বয়ে অক্সিজেন, নিয়ন, সিলিকন চক্র চলতে চলতে শুরু হয় লৌহ চক্র। এই পর্যায়ে এসে মহাকর্ষের কারণে সৃষ্ট শক্তিশালী চাপের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের চাপ আর ধরে রাখতে পারে না। তখন চুপসে যেতে থাকে নক্ষত্রের কেন্দ্র। চুপসে যেতে যেতে একপর্যায়ে বাইরের দিকে আকস্মিকভাবে ঘটে সুপারনোভা বিস্ফোরণ। তাতে নক্ষত্রটির সবকিছু টুকরা টুকরা হয়ে মহাকাশের চারদিকে ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ে। এই সুপারনোভা বিস্ফোরণ চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো। একে বলা চলে মহাজাগতিক আতশবাজি।

এই দীপ্তির পরিমাণ আমাদের সূর্যের চেয়ে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন গুণ বেশি। আরও সহজ করে বলতে গেলে একটা সুপারনোভা মাত্র কয়েক মিনিটে যে পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে, সমপরিমাণ শক্তি বিকিরণ করতে আমাদের সূর্যের লাগবে গোটা জীবন। মানে ১০ বিলিয়ন বছর। কাজেই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মহাকাশে বা কোনো গ্যালাক্সিতে সুপারনোভা শনাক্ত করা মোটামুটি সহজ। অনেক সময় খালি চোখেই আকাশে তা শনাক্ত করা যায়। মধ্যযুগে চীনে এ রকম একটি সুপারনোভা দেখার বিবরণ পাওয়া যায়।

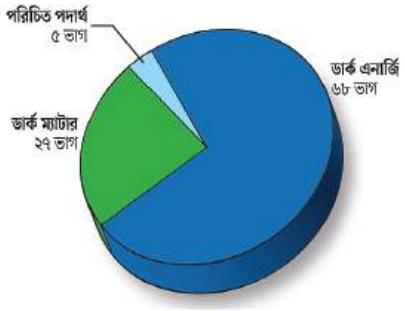
প্রচণ্ড অগ্নিময় ও ঘটনাবহুল সুপারনোভা নিয়ে অনেক দিন ধরেই পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা। তাই এদের আচার-আচরণ তাদের বেশ ভালোই জানা। এই বিস্ফোরণ প্রায় একইভাবে ঘটে এবং বিকিরণ বা আলোও নিঃসরণও করে প্রায় একই পরিমাণ। কাজেই এদের আলোকে মহাবিশ্বের কোনো বস্তুর আপেক্ষিক দূরত্ব মাপার জন্য রেফারেন্স বা মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাই সুপারনোভাকে একসময় আদর্শ বাতি বা স্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডল হিসেবে বেছে নেন বিজ্ঞানীরা। আবার এর লোহিত বিচ্যুতি মেপে নির্ণয় করা যায়, এরা কত দ্রুত আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সাধারণত দুই ধরনের সুপারনোভার কথা বলেন জ্যোতির্বিদেরা। একটা টাইপ ওয়ান এবং আরেকটি টাইপ টু। দুই ধরনের মধ্যে আরও উপধরণও আছে। জটিলতা এড়াতে এখানে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলছি না। এর মধ্যে টাইপ ওয়ানের এ ধরনটিকে আদর্শ বাতি হিসেবে ব্যবহার করল ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই গবেষক দল। এবারও দেখা গেল, মহাবিশ্বের সবকিছু ছুটছে দিগ্বিদিক। মানে প্রসারিত হচ্ছে। কাজেই ১৯২০-এর দশকে মহাবিশ্বের প্রসারণ নিয়ে হাবলের সিদ্ধান্তে কোনো ভুল নেই। কিন্তু নতুন আরেকটি ফলাফল দেখে দুই দল বিজ্ঞানীর চোখ কপালে উঠল। সেটা কী?

এ গবেষণায় কাছে ও দূরের সুপারনোভাগুলোর লোহিত বিচ্যুতি ও উজ্জ্বলতা মাপলেন পার্লমুটার এবং রিসের দল। এর মাধ্যমে মহাবিশ্ব বর্তমানে কত দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে, তা মাপা গেল। বহুদূরের সুপারনোভাদের লোহিত বিচ্যুতি মেপে পাওয়া গেল মহাবিশ্ব অতীতে কী হারে বা কত দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিল, তার পরিমাণ। এরপর এই দুই ফলাফল তুলনা করে দেখা হল। বিস্ময়কর ব্যাপার, মহাবিশ্ব অতীতের চেয়ে বর্তমানে অনেক বেশি দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। এর সরল অর্থ, মহাবিশ্ব শুধু প্রসারিতই হচ্ছে না, কোনো একভাবে এর গতিও বেড়ে যাচ্ছে।

কোনো বস্তু বা ভর যদি বেগ পরিবর্তন করে, তাহলে বিজ্ঞানীরা বলেন, তার পেছনে কোনো বল বা ফোর্স কাজ করছে। আর কোনো কিছুর বল প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা মানে, তার শক্তি বা এনার্জি আছে। মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাংয়ের পর থেকে মহাবিশ্বের শক্তির পরিমাণ বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা হিসাব কষে বের করেছেন, এই শক্তি ঘনত্বে মহাবিশ্বের কী হারে প্রসারিত হওয়া

উচিত। কাজেই মহাবিশ্বের সবকিছু এই অনুমিত হারের চেয়ে বেশি জোরে ছোটার অর্থ হলো তার পেছনে অতি অবশ্যই কোনো শক্তি দায়ী। সেই শক্তির নাম দেওয়া হলো ডার্ক এনার্জি। বাংলায় যাকে বলা হয় গুপ্তশক্তি। তমোশক্তিও বলেন কেউ কেউ। অনেকে হয়তো ভাববেন, শক্তিটার রং কালো বলে এমন নাম। আসলে তা নয়। শক্তিটা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনো পুরোপুরি অন্ধকারে আছেন, এ সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। তাই অজানা-অচেনা শক্তির এই নাম দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$-এর সঙ্গে মোটামুটি সবাই পরিচিত। এই সমীকরণ অনুসারে, শক্তি ও ভর পরস্পর রূপান্তরযোগ্য। অর্থাৎ শক্তিকে ভরে এবং ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। সেই অনুযায়ী ডার্ক এনার্জির ভর কতটা হতে পারে, সেই হিসেব কষা হয়েছে। এভাবে মহাবিশ্বে ডার্ক এনার্জির যে পরিমাণ পাওয়া গেছে, বিভিন্ন গবেষক দলের হিসাবে তাতে কিছুটা তফাত আছে। গড় হিসাবে এর পরিমাণ প্রায় ৬৮ ভাগ। আর মহাবিশ্বের বাকি অংশগুলোর মধ্যে ২৭ ভাগ ডার্ক ম্যাটার বা গুপ্ত বস্তু এবং মাত্র ৫ ভাগ দিয়ে আমাদের চেনা পরিচিত বস্তুজগৎ–মানে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, ধূমকেতু, গ্রহাণু, আমাদের সৌরজগৎ, পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ এবং জীবজগৎ গঠিত।



রহস্যময় ডার্ক ম্যাটার আবিষ্কারের জন্য ২০১১ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পায় সল পার্লমুটারের সুপারনোভা কসমোলজি প্রজেক্ট এবং অ্যাডাম রিস ও ব্রায়ান পল শ্মিটের হাই-জেড টিম। অনেকেই প্রশ্ন করবেন এ লেখার শুরুতে যে আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবকের কথা বললাম, তার সঙ্গে ডার্ক এনার্জির সম্পর্ক কী? এর উত্তরে বলতে হয় অনেকে মনে করেন, রহস্যময় ডাক এনার্জিই আসলে আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবক। ডার্ক এনার্জিও কাজ করে প্রতিমহাকর্ষের মতো। অনেকের হিসাবে, দুটোর মানও সমান। এভাবেই ডার্ক এনার্জির কাঁধে চেপে মহাসমারোহে ফিরে এসেছে মহাজাগতিক ধ্রুবক। কিন্তু সেটাই এখন বিজ্ঞানীদের কাছে দুঃস্বপ্নের নাম। ভাবছেন, কেন?

কারণ, বিজ্ঞানীরা হাজারো চেষ্টা করেও এখনো বুঝে উঠতে পারেননি এই ডার্ক ম্যাটার আসলে কী। অনেকে অনুমান করার চেষ্টা করেছেন, প্রকৃতির চারটি মৌলিক বল–মহাকর্ষ, তড়িচ্চুম্বকীয় বল, সবল নিউক্লিয়ার বল ও দুর্বল নিউক্লিয়ার বলের মতো এটাও নতুন কোনো মৌলিক বল। কিন্তু সেই অনুমানও শেষ পর্যন্ত ধোপে

টেকেনি। আবার অনেকের ধারণা, সেটা আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা কোয়ান্টাম ক্ষেত্রের ফলাফল হতে পারে। কিন্তু ওই অনুমান পর্যন্তই, কোনো ধারণা কাজে লাগিয়েই শেষ পর্যন্ত এর রহস্য ভেদ করা যায়নি। তাই মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় রহস্যগুলোর মধ্যে অন্যতম এখন ডার্ক এনার্জি।

তথ্যসূত্র:

উই হ্যাভ নো আইডিয়া/ জর্জ চ্যাম
অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল/ টিম জেমস
ফর দ্য লাভ অব ফিজিকস/ ওয়াল্টার লুইন, ওয়ারেন গোল্ডস্টেইন
মহাজাগতিক প্রথম আলো/ আবুল বাসার
উইকিপিডিয়া

লেখক:
আবুল বাসার
নির্বাহী সম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা

আলো এক অদৃশ্য জাদুকর

মোঃ ইসমাইল হোসেন আশিক

আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন বা সমাবর্তন–এসব তো আমরা ছোটবেলা থেকেই বইয়ে পড়েছি। তাই আজকে সেই পুরনো কথা নয়। বরং আসুন আলোকে একটু নতুন চোখে দেখি। আলো কেবল একটা ভৌত ঘটনা নয়, বরং এক রহস্যময় জাদুকর যে আমাদেরকে প্রতিদিন এমন অনেক কিছু দেখায়, যেগুলো আদতে হয়তো সেই মুহূর্তে আর সত্যিই নেই!

ভাবতে অবাক লাগছে? চলুন একে একে বোঝা যাক।

ধরে নিন আমি যদি বলি, আমরা যা দেখি, সবই ভূত। শুনে হয়তো সবাই হাসবে। কিন্তু যদি আমি "ভূত" শব্দের মানে বদলে দিই? যদি বলি, ভূত মানে সেই বস্তু বা ঘটনা, যেটা আমরা দেখি কিন্তু সেটা আর এখনকার মুহূর্তে নেই, বরং কিছু সময় আগের অবস্থায় রয়েছে। এভাবে দেখলে, আলো আমাদের প্রতিদিন "ভূত" দেখায়।



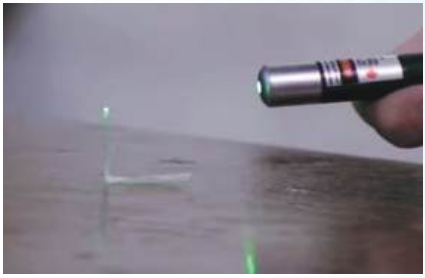
রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু আমরা কি তাদের আসল অবস্থাই দেখছি? না। উদাহরণ হিসেবে নিন Proxima Centauri–কে। এটি পৃথিবী থেকে ৪.২৪ আলোকবর্ষ দূরে। এর মানে হলো, এর আলো আমাদের চোখে পৌঁছাতে চার বছর চার মাস সময় নেয়। আমরা আজকে যে প্রোক্সিমা সেন্টরির ঝিলিক দেখছি, সেটা চার বছর আগের অবস্থা! যদি সে তারাটিতে আজ কোনো বিস্ফোরণ ঘটে, আমরা সেটা দেখব ৪ বছর পর।

এবার একটু কাছাকাছি আসি। চাঁদ থেকে আলো আসতে সময় লাগে মাত্র ১.৩ সেকেন্ড। সূর্য থেকে আলো পৌঁছাতে সময় লাগে প্রায় ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড। অর্থাৎ, আমরা সূর্যের যা দেখি সেটা আসলে ৮ মিনিট আগের সূর্য। তাহলে পৃথিবীতে আমরা যা দেখি, সেটা কখনোই "এখন"-এর দৃশ্য নয়। সবকিছুই সামান্য হলেও অতীত।

তাহলে কি আমরা কখনোই বর্তমান দেখি না? হ্যাঁ! এই সত্যটা একদিকে ভয়ের, অন্যদিকে আশ্চর্যের। ধরুন, পৃথিবী থেকে ১০০ আলোকবর্ষ দূরের কোনো তারায় আজ সুপারনোভা বিস্ফোরণ হলো। আমরা সেটা দেখব ১০০ বছর পর। এর মানে হতে পারে–যে উজ্জ্বল তারাটিকে আমরা আজ দেখে আনন্দ পাচ্ছি, সেটা হয়তো বহু বছর আগেই নিভে গেছে। তবুও আমরা তার আলো দেখি। একে এক অর্থে "ভূত" না বলে আর কী বলবো?

এবার আসি আরেকটি মজার তথ্যের দিকে। আলোর সাধারণত কোনো ভর নেই বলে আমরা জানি। যেহেতু আলোর ভর নেই, তাহলে এর ভরবেগ থাকার কথা নয়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, আলোর ভরবেগ আছে! বিজ্ঞানের ভাষায় আলোর ভরবেগ বের করতে হয় $P = h / \lambda$ এই সমীকরণ দিয়ে।

এখন প্রশ্ন–যদি আলোর ভরবেগ থাকে, তাহলে আলো আমাদের ধাক্কা দিলে আমরা পিছিয়ে যাই না কেন? এর উত্তর হলো–আলোর ভরবেগ এত ক্ষুদ্র যে তা আমাদের শরীরের মতো বড় বস্তুকে নড়াতে পারে না। কিন্তু সূক্ষ্ম ও হালকা কোনো কণা বা আয়নার উপর প্রচুর আলো ফেললে, সেটিকে স্থানচ্যুত করা যায়। বিজ্ঞানীরা এই ধারণা ব্যবহার করে "সোলার সেল" তৈরি করেছেন, যা ভবিষ্যতে মহাকাশযানকে আলোর শক্তিতে চালাতে সাহায্য করতে পারে।



এখন কল্পনা করুন, আলো শুধুই আমাদের চোখে ছবি আঁকে না, বরং মহাবিশ্বের রহস্যও উন্মোচন করে। আমরা যে নক্ষত্রের আলো দেখি, তার ভেতর লুকিয়ে থাকে তার রাসায়নিক গঠন, তাপমাত্রা, এমনকি বয়সের তথ্য। বিজ্ঞানীরা স্পেকট্রোস্কোপির মাধ্যমে সেই তথ্য বের করে মহাকাশের রহস্যভেদ করেন।

আলো আমাদের সভ্যতাকে বদলে দিয়েছে। আজকে আমরা অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল দিয়ে ইন্টারনেট চালাই, লেজার দিয়ে অপারেশন করি, সৌরশক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করি। আবার আলো ছাড়া আমাদের রঙ, সৌন্দর্য, এমনকি সময়ের ধারণাটাও ভিন্ন হয়ে যেত। শুধু এখানেই থেমে নেই। মানবজাতির দৃষ্টি এখন মহাকাশে। নাসার "জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ" মহাবিশ্বের জন্মের প্রথম আলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। হয়তো খুব শিগগির আমরা মহাবিশ্বের অতীতের আরও গভীর রহস্য জানতে পারবো।

আলো শুধু বিজ্ঞান নয়–এটা কবিতা, দর্শন, আর রহস্যেরও উৎস। যেদিন আমরা আলোকে পুরোপুরি বুঝে ফেলবো, সেদিন হয়তো মহাবিশ্বের অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাব।

রেফারেন্স:

1. The story of optics- The beginning of Modern optics-
https://www.banglaphysics.in/2023/03/LightChap1.html?utm_source=chatgpt.com

2. ফোটন (Wikipedia evsjv) – ফোটনের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%A8

3. Photon (English Wikipedia) – কোয়ান্টাম দৃষ্টিতে ফোটনের তথ্য
https://en.wikipedia.org/wiki/Photon

4. What is Light – English-Bangla – আলো কি ও তার সংজ্ঞা
https://www.english-bangla.com/lessons/definition/definition-of-light-in-bengali

5. YouTube – ÒMomentum of Photon
https://m.youtube.com/watch?v=rc2vYBqaM3U

লেখক:
মোঃ ইসমাইল হোসেন আশিক
ফার্মেসি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

Moonbow: The Symphony in White

Salahuddin Mokbul Galib

Imagine you are standing under the midnight sky, drenched in the silver glow of a full moon. Suddenly, a spectral arc of white light pierces the darkness, shimmering like a ghostly spirit against the stars. You are witnessing a lunar rainbow, a rare celestial glitch where moonlight replaces the sun to fracture the night. This ethereal phenomenon is a masterclass in atmospheric precision and hidden beauty. Lets strip away the darkness and reveal its secrets.

What is a Moonbow?



A moonbow, also known as a lunar rainbow, is a rare and beautiful optical phenomenon that occurs when moonlight is refracted, reflected, and dispersed by water droplets in the air, creating the ghost of a rainbow haunting the midnight sky. Unlike solar rainbows, moonbows are much dimmer because moonlight is far less intense than sunlight.

How Moonbows Form?

Moonbows typically appear opposite the Moon in the sky when the Moon is low, usually within 42 degrees of the horizon. They require specific conditions: a nearly full Moon, a dark sky free from light pollution, and a source of water droplets such as waterfalls, rain, or ocean spray.

The light from the Moon passes through these droplets, bending at different angles for each color wavelength, though the colors are often too faint for the human eye to distinguish clearly.



Difference from Solar Rainbows

Solar rainbows are bright and display vivid colors because of the Sun's strong light. In contrast, moonbows appear mostly white or pale to the naked eye due to the low intensity of moonlight. Long-exposure photography can reveal their hidden spectrum of colors, making moonbows look more like traditional rainbows in images than in real life.

Best Places and Times to See a Moonbow

Moonbows are best observed around waterfalls like Victoria Falls in Africa, Yosemite Falls in the USA, or Cumberland Falls in Kentucky. They are most visible during spring and autumn when the Moon is full and the sky is clear. Viewing requires patience, a moonless or minimally light-polluted area, and positioning yourself so the Moon is behind you with mist or rain in front.

Can We Witness a Moonbow in Bangladesh?

While seeing a moonbow in Bangladesh is technically possible under the absolute perfect conditions, it remains an exceedingly rare atmospheric anomaly. To catch this spectral arc, you need a brilliant, unobstructed full moon positioned low in the sky, paired with localized rainfall directly opposite it in a pitch-black environment. Bangladesh's heavy monsoon season provides the necessary rain, but the country's severe light pollution and persistent nighttime haze almost always drown out the faint, ghostly glow. Your best shot at witnessing this midnight glitch would be in remote, untouched areas like the deep Sundarbans or the silent hills of Bandarban, far from the glare of civilization. Even there, the timing must be flawless, turning a moonbow sighting into a true once in a lifetime atmospheric alignment.

References:

• Wikipedia: Moonbow - Overview of optical formation and viewing conditions.

• Met Office (UK): What is a moonbow? - Meteorological breakdown of atmospheric requirements.

• U.S. National Park Service & UNESCO: Case studies on Yosemite Falls and Victoria Falls - Geographic data on predictable moonbows.

• Optics (by Eugene Hecht): Scientific reference for light refraction, dispersion and the 42° viewing angle.

• Visual Physiology Studies: Reference for scotopic vision (how the human eye perceives faint light in the dark).

Writer:
Salahuddin Mokbul Galib
Shobujbagh Govt. College Dhaka Science Club